ভূতের নাম রমাকান্ত কামার

ইমদাদুল হক মিলন

ভূতের নাম রমাকান্ত কামার । ইমদাদুল হক মিলন

B
MILA

ভূতের নাম রমাকান্ত কামার

ইমদাদুল হক মিলন

শিখা সংস্করণ ❑ বইমেলা-ফেব্রু : ২০০৬

স্বত্ব ❑ নির্বাচিতা হক/অভেচ্ছা হক

প্রকাশক ❑ নজরুল ইসলাম বাহার, শিখা প্রকাশনী ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

অক্ষরবিন্যাস ❑ ঈশিন কম্পিউটার, পারগেন্ডারিয়া, কেরানীগঞ্জ,

ঢাকা-১৩১০, মোবাইল-০১৭১-০৪৫৫৮৩

মুদ্রণ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

মূল্য ❑ ৬০.০০ টাকা

VUTER NAM ROMAKANTO KAMAR : (A novel) By Imdadul Haq Milon.

Published by : Nazrul Islam Bahar Shikha Prokashoni, 38/2-ka, Banglabazar, Dhaka

Computer Compose : Eshin Computer, Pargardariya, Keranigong, Dhaka-1310

Shikha Edition : 2006

Price : Taka 60.00 only

ISBN 984-454-121-5

উৎসর্গ

গুলফার রহমান রিটন

প্রিয়বরেষু

ঘুমঘুমির মাঠে খেলা করতে এসে একটি ভূত পথ হারিয়ে ফেললো। অমাবশ্যার রাত। দোয়াতের কালির মতো অন্ধকার চারদিক। এই অন্ধকারে মানুষ তো দূরের কথা ভূতেরাও চোখে দেখতে পায় না।

ভূতেদের নিয়ম হচ্ছে দিনের আলো ফুটে ওঠলে তারা আর বাড়ি ফিরতে পারে না। মানুষ কিংবা অন্য কোনো জীবের রূপ ধরে লোকালয়ে থেকে যায়। তারপর আবার যখন রাত হয় তখন ফেরে।

কিন্তু এই ভূতটি অতো সব নিয়ম জানে না। তার বয়স কম। এগারো বারো বছর হবে। নাম রমাকান্ত কামার। ভূতেরা ভূত বলে মানুষের মতো নাম রাখতে পারে না। মানুষের নামই উল্টে রাখে। যেমন টিকারামের নাম মরাকাটি। গদাই লসকরের নাম রকসল ইদাগ।

কিন্তু এই ভূতটির নাম কি করে যেনো মানুষের মতো হয়ে গেছে। তার জন্মের পর মা বাবা আদর করে নামটি রেখেছিলো। ভূতেদের নিয়ম অনুযায়ী মানুষের নামই উল্টে রেখেছিলো। রেখে বোকা বনে গেছে। রমাকান্ত কামার নামটি এমন এটি উল্টে দিলেও রমাকান্ত কামারই হয়।

তো সেই রাতে হলো কি ঘুমঘুমির মাঠে খেলা করতে করতে রমাকান্ত ভুলেই গেলো রাতও এক সময় শেষ হয় দিনের আলোও এক সময় ফুটে ওঠে।

খুবই বেদিশে হয়ে খেলা করছিলো সে। রাত শেষ হওয়ার সামান্য আগে টের পেলো বাড়ি ফেরার পথটি হারিয়ে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেলো রমাকান্তর। পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করলো। মাঠের এদিক যায়, ওদিক যায় কিন্তু পথ আর খুঁজে পায় না।

পাবেই বা কি করে! ঘুমঘুমির মাঠ কি যাচ্ছেতাই মাঠ! তেপান্তরের মাঠকেও হার মানায়, এতো বড়ো। এ মাথায় দাঁড়ালে ওমাথা দেখা যায় না।

ঘুমঘুমির মাঠের ঠিক মাঝখানে আছে বিশাল একটি দেবদারু গাছ। গাছটির বয়সের কোনো গাছ পাথর নেই। তিন চারশো বছর তো হবেই। মাথাটি এতো উঁচু, একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। বর্ষাকালে আকাশ দিয়ে যখন কালো

মেঘ পাখির মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় তখন একটি দুটো আনমনা বোকা মেঘ প্রায়ই দেবদারু গাছটির মাথায় এসে আটকে পড়ে। যেখানে গিয়ে ঝরার কথা সেখানে আর যেতে পারে না। মনের দুঃখে কান্না শুরু করে। তাদের চোখের জল টপটপ করে পড়ে দেবদারুর ডালপালায়। ফলে সারাটা বর্ষাকাল গাছটি থাকে বৃষ্টিভেজা। ডালপালা চকচক করে।

রমাকান্ত খেলা করছিলো দেবদারু তলায়। রাত শেষ হয়ে আসছে দেখে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে সে যখন মাঠের পূব প্রান্তে এলো তখন দিনের আলো একটু একটু করে ফুটছে। পায়ের তলার মতো ফর্সা হয়ে যাচ্ছে চারদিক। দেখে রমাকান্ত খুবই ভড়কে গেলো। বুকটা কাটা কইমাছের মতো ধড়ফড় ধড়ফড় করতে লাগলো তার।

মাঠের পূবদিকে আছে ঝিরঝিরে একটি নদী। এখন গ্রীষ্মকাল বলে নদীর জল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে। একটি ছাগল নদী পার হতে গেলে তার হাঁটু অব্দি হবে জল। তবে জলটা খুব পরিষ্কার। তলায় কি আছে না আছে সব দেখা যায়।

নদীর ওপারে ফসলের মাঠ। তারপর গ্রাম। ছোটদের আঁকা ছবির মতো মানুষের ঘরবাড়ি। এই গ্রাম থেকে রাখাল বালকরা গরুর দল নদীর ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে ঘুমঘুমির মাঠে চড়াতে নিয়ে আসে।

রমাকান্ত নদীর দিকে তাকালো। গ্রামের দিকে তাকালো। তারপর হাত পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লো। মনটা খুবই খারাপ হয়েছে তার। ভারি কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। বিহিত একটা করতেই হবে। কি করা যায়?

রমাকান্ত গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো।

ভূতেরা, মানে একটি ধারিভূত উনত্রিশটি রূপ ধরতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে রূপ ধরা একটি একটি করে বাড়ে তাদের। মানুষের যেমন বাড়ে বুদ্ধি।

কিন্তু রমাকান্তর বয়স কম। সে এখনো নাবালক ভূত। সবগুলো রূপ ধরতে শেখেনি। শিখেছে মাত্র পাঁচটি। মানুষ ঘোড়া কুকুর সাপ আর বাঘ।

তবে রূপ নিয়ে রমাকান্তর কোনো অহংকার নেই। একটুখানি দুঃখ আছে। তার ভারি শখ পাখির রূপ ধরা। কিন্তু পাখির রূপ হচ্ছে ন নম্বর। শিখতে আরো আট দশ বছর লাগবে। ইস্ চোখের পলকে যদি আট দশটি বছর কেটে যেতো! ইচ্ছে করলেই যদি পাখি হতে পারতো রমাকান্ত তাহলে মাটিতে সে নামতোই না। খেলতে যেতো আকাশে। ঘুমঘুমির মাঠে কোনো ভদ্রভূত খেলতে আসে! এমন

পচা মাঠ, একটু আনমনা হলেই বাড়ি ফেরার পথ হারিয়ে যায়। আর খেলার সময় বুঝি কেউ পথের কথা ভেবে বসে থাকে!

মাঠের প্রান্তে বসে এসব ভেবে রাগও হচ্ছিলো রমাকান্তর। কিন্তু রাগ করে তো লাভ নেই। ফেরার পথ যখন হারিয়েই গেছে কি আর করা! দিনটা এই মাঠে বসেই কাটাতে হবে। রাত হলে পথ খুঁজে বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা মা চিন্তায় আছে।

কিন্তু ভূত হয়ে কি দিন কাটানো যাবে? মাঠে বসে থাকা যাবে! আরে না! তাহলে কেচ্ছা কেলেংকারি হয়ে যাবে। কেউ যদি দেখে আস্ত একটা ভূত বসে আছে মাঠে তাহলেই হয়েছে! দিকে দিকে সাড়া পড়ে যাবে। ভূত দেখতে ভিড় করবে রাজ্যের লোক। রমাকান্ত ভাবলো সে অন্য কোনো রূপ ধরবে।

কি রূপ?

ঘোড়া! রমাকান্ত কি ঘোড়া হয়ে যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো ঘোড়া হলে বিপদ আছে। মাঠে গরু চড়াতে এসে রাখাল বালকরা যখন দেখবে সুন্দর একটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে খুশিতে পাগল হয়ে যাবে তারা। পেয়ে বসবে। মানুষ ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসে। ঘোড়া দৌড়াতে ভালোবাসে। এই জন্যে মানুষের সমাজে ঘোড়ার খুবই কদর। ঘোড়া কোনো হেজিপেজি জীব নয়। দামী জীব। ওরকম জীব হাতের কাছে পেলে রাখাল বালকরা আহলাদে ঘোলো সতেরোখানা হয়ে যাবে। চারদিক থেকে ঘেরাও করে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘোড়ার ওপর। কেউ টেনে ধরবে লেজ, কেউ ধরবে পা, কেউ বা গলা। একা একটি ঘোড়া কিছুতেই অতোগুলো বালকের সঙ্গে এঁটে উঠবে না। কায়দা করতে পারলেই গরুর দড়ি দিয়ে লাগাম বাঁধবে তারা। তারপর পিঠে চড়ে পুরো মাঠ দৌড়োও। না দৌড়োতে চাইলে, ত্যাদড়ামো করলে গরু চড়াবার তেল চকচকে লাঠি দিয়ে বেদম প্যাদানি লাগাবে। লাঠিগুলোর মাথায় আবার কাঁথা সেলাবার মোটা সূচ বসানো থাকে। যে গরুগুলো মহা বেয়াদব, লাঠির বাড়ি কেয়ার করে না সেগুলোকে সূচ বসানো লাঠির ডগা দিয়ে খোঁচা মারা হয়।

ওরে বাপরে! ওরকম চার পাঁচখানা খোঁচা খেলে কম্মো সারা। হাত পা টানা দিয়ে চিৎপটাং হয়ে যেতে হবে। ইহ জনমে উঠে দাঁড়াতে হবে না। জান হাপিস। সন্ধের পর ভূত হয়ে যে বাড়ি ফিরবে গতরে আর সেই বল থাকবে না।

মুহূর্তে ঘোড়া হওয়ার চিন্তা বাতিল করে দিলো রমাকান্ত। না না ঘোড়া হওয়া

যাবে না। মোড়া হয়ে বেঘোরে মরবে নাকি!

তাহলে?

রমাকান্ত কি কুকুর হবে! কুকুর হয়ে সারাদিন বসে থাকবে ঘুমঘুমির মাঠে!

ভূতেদের স্বভাব হচ্ছে যে কোনো রূপ ধরার আগে বিপদের কথাটা ভাবা।

রমাকান্তও ভাবতে লাগলো। কুকুর হলে কি কি বিপদ হতে পারে!

আবার সেই রাখাল বালকদের কথা মনে পড়লো। মাঠে গরু ছেড়ে দেয়ার পর আর কোনো কাজ থাকে না তাদের। হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে মেতে ওঠে তখন। খেলা করে, মজা করে। এ অবস্থায় যদি একটি কুকুর পাওয়া যায়, নেড়ি হোক কি অন্য, কোনো কথা নেই কুকুর নিয়ে মেতে উঠবে তারা। ঢিল ছুঁড়ে মাথাটাথা ফাটিয়ে ফেলবে। রাগে কোনো রাখালের দিকে তেড়ে গেলেই সূচ বসানো লাঠির খোঁচা। খোঁচাতে খোঁচাতে হয়তো মেরেই ফেললো। তারপর কুকুর লাশটি দিলো নদীতে ফেলে।

আরেকটা কাজ কুকুর রমাকান্ত অবশ্য করতে পারে, রাখালদের ঢিল খেয়ে গ্রামের দিকে ছুটে গেলো। তাহলেই তো পগার পাড়। দিনটা গ্রামে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দিলো। তারপর সন্ধে হলেই তো....

ভাবনাটা শেষ করতে পারলো না রমাকান্ত। তার আগেই আর একটি বিপদের কথা মনে পড়লো। গ্রামের নেড়িকুত্তাগুলো আছে না! ওগুলো তো সবসময় দল বেঁধে চলাফেরা করে। ভারি এককাট্টা স্বভাব তাদের। শেয়াল তাড়ায় দল বেঁধে, মরা গরু খায় দল বেঁধে, গ্রাম পাহাড়া দেয় তাও দল বেঁধে। আপন দলের কাছে অচেনা কুত্তা দেখলে রাগে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তাদের। নেড়ি কুত্তারা মানুষের চেয়েও হিংসুটে। অচেনা কুত্তা রমাকান্তকে পেলে আর আস্ত রাখবে না। একত্রে চারদিক থেকে আক্রমণ চালাবে। ভূত কুত্তা হয়েও, গায়ে ভূতের মতো তাকৎ থাকার পরও পাঁচ মিনিটের বেশি তাদের সঙ্গে টিকতে পারবে না রমাকান্ত। হাপিস হয়ে যাবে। খুবলে কান ছিঁড়ে নেবে কেউ, নাকের ডগা ছিঁড়ে নেবে। কাঁটা চামচের মতো নখ দিয়ে আলতো করে হয়তো তুলে নেবে চোখ দুটো, যেনো সেদ্ধ ডিম তুলছে বাটি থেকে।

মাগো ভাবাই যায় না!

কান না থাকলে রমাকান্ত শুনবে কি করে!

চোখ না থাকলে দেখবে কি করে!

আর যদি নাকটাই না রইলো তাহলে গন্ধের কি হবে!

এমনিতেই বাড়ির পথ হারিয়ে ফেলেছে, তার ওপর চোখ নেই, তাঁহা অন্ধ হয়ে গেছে, বাড়ির পথ তো কোনো দিনও খুঁজে পাবে না রমাকান্ত। কারু সাহায্য নেবে সে উপায়ও নেই। অন্ধ ভূতকে পথ দেখাবে কে!

মানুষ!

আরে না! মানুষ ভূত দেখতে পারে না। ভূতের নাম শুনলেই গালাগাল দেয়। ভূত আমার পুত, এসব বলে।

মানুষের সমাজে মেয়ে ভূতের নাম পেত্নি। মানুষ পেত্নিকেও গাল দেয়। বলে পেত্নি আমার ঝিঃ ছিঃ এটা কোনো কথা হলো!

এসব ভেবে রমাকান্ত খুবই মাইণ্ড করলো। কুকুর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কুকুর হলে বেজায় অপমান। মারধোর তো আছেই তার ওপর মানসম্মান নিয়ে টানাটানি। মারধোর খাওয়া যায় কিন্তু সম্মান কি হারানো যায়!

মার খেলে ভূতেদের কিন্তু সম্মান যায় না। মারকে তারা কোনো অপমানই মনে করে না।

যাহোক রমাকান্ত তাহলে কি করবে! সাপ হয়ে দেখবে! নাকি বাঘ!

আচ্ছা সাপ হলে কেমন হয়! এই ধরো ছোটখাটো বোকা ধরনের একটা সাপ। ঘাসের ওপর চুপচাপ সারাদিন পড়ে রইলো, সন্ধের আগে মাথাই তুললো না।

তখুনি আর একটি বিপদের কথা মনে হলো। ঘুমঘুমির মাঠের মাথার ওপর যে আকাশখানা আছে সেখানে পুলিসের মতো টহল দেয় বাঘাবাঘা সব বাজপাখি। পায়ের নখ তাদের বোয়াল মাছ ধরার বড়শির মতো। খোলা মাঠে ওরকম সাইজের একটি সাপ পড়ে থাকতে দেখলে আকাশ থেকে একেবারে বোমারু বিমানের কায়দায় ডাইভ দেবে তারা। নখে সাপখানা গেঁথে সোজা গিয়ে বসবে দেবদারুর মগডালে। তার পরের দৃশ্যটি ভাবাই যায় না।

রমাকান্তর গায়ের লোম সজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে গেলো।

মাথা খারাপ! ছোট সাপ হয়ে পৈতৃক প্রাণটা দেবে নাকি! প্রাণটা একবার দিয়ে ফেললেই তো গেলো! আর তো জন্ম নেয়া যাবে না। ভূত মরে তো ভূত হয় না। কোনো কোনো বদমাশ মানুষ মরে ভূত হয়। যেমন মীর জাফর। নবাব সিরাজউদদৌলার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো।

যাকগে, রমাকান্ত যদি বড়ো সাপ হয়, ময়াল মানে অজগর তাহলে কেমন হয়! বাজপাখিরা তো তাহলে কিছুই করতে পারবে না তার। ওরকম দশ বিশটা বাজ নিঃশ্বাসে হজম করে ফেলবে সে।

এই তো পাওয়া গেছে।

রমাকান্ত মহাখুশি। দিকপাশ আর চাইলো না, মুহূর্তে বিশাল অজগর হয়ে গেলো। লেজটা চলে গেলো মাঠের মাঝখানে আর মুণ্ডুটা নদীতে।

অজগর হয়েই আরামের একটা শ্বাস ফেললো সে। যাক ঝামেলা গেছে। সন্ধে অব্দি আর কোনো চিন্তা নেই। মাথা ঘুরিয়ে একবার নিজের দেহটির দিকে তাকালো। তাকিয়ে নিজের প্রতিভায় নিজেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো। বাহ বেশ তো আজদাহা একখানা দেহ পাওয়া গেছে। ভালো, বেশ ভালো।

ঠিক তখুনি ছোটখাটো একটি দুটি বিপদ টের পেলো রমাকান্ত। মুণ্ডুটি তো তার নদীতে, ফলে সে যখন শ্বাস নেয় শ্বাসের সঙ্গে নদীর পুরো জল ঢুকে যায় পেটে। প্রশ্বাসে জলটা এমন ভাবে বেরোয়, নায়াগ্রার জলপ্রপাতও তার কাছে নস্যি।

দুতিনবার শ্বাস নিয়ে শ্বাস ফেলে তিতিবিরক্ত হয়ে গেলো রমাকান্ত। ধুৎতেরি। এ তো দেখি মহা ফ্যাচাং।

দ্বিতীয়বার শ্বাস নেয়ার সময় অতিকায় চার পাঁচটা কচ্ছপ পেটে চলে গেলো। শ্বাস ফেলবার আগেই পেট থেকে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে এলো। টেরই পেলো না কোথায় ঢুকেছিলো, কোথা থেকে বেরুচ্ছে। কচ্ছপগুলো একেবারেই গাধা। তবে কচ্ছপরা যখন সার ধরে হেঁটে অজগর রমাকান্তর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো গলায় ভারি বিচ্ছিরি একটা সুড়সুড়ি লাগলো তার। মানুষের খোলা পিঠে হঠাৎ করে দুচারটে গেছো পিঁপড়ে চড়লে যেমন অনুভূতি হয় গলার ভেতর তেমন একটা ভাব হলো। এতে অবশ্য খুব একটা বিরক্ত হলো না সে। কিন্তু বিরক্ত হলো আঁড় মাছের ব্যাপারটায়। সাত সাতটা রাঘব সাইজের আঁড় তৃতীয় শ্বাসে পেটে ঢুকে গেলো রমাকান্তর। আঁড় মাছের মাথার দুপাশে এরোপ্লেনের ডানার মতো দুখানা করে কাঁটা থাকে। পিঠে থাকে একখানা। অজগর রমাকান্তর গলায় ঢুকে তারা সাতজন একত্রে কাঁটা মেলে দিলো। ভাগ্যিস সময় মতো ব্যাপারটা টের পেয়েছিলো রমাকান্ত, সঙ্গে সঙ্গে খকখক করে কেশে গলা থেকে তাদের সাতজনকেই বের করেছে। তারপরই দুতিনটে হাঁচি হলো তার। রমাকান্তর আবার ঠাণ্ডার বাই আছে। বৃষ্টি বাদলায় মা বাবা তাকে ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। শীতকালে রমাকান্ত বেরোয় বাইসনের তিনখানা চামড়া একটার ওপর আরেকটা পরে। এমন শীতকাতুরে ভূত রমাকান্তর মুণ্ডুটা যদি দিনমান ভেজে নদীর জলে তাহলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। ভূতেদের মধ্যে আবার নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার ডাক্তার নেই। জিনিসটা একবার বাঁধাতে পারলে

নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অজগর দেহটা কমিয়ে ফেললো রমাকান্ত। পনেরো বিশ হাত লম্বা হয়ে মোটামুটি একটা সাইজে এলো।

আহা কি সুন্দর লাগছে এখন নিজেকে! লেজটা ছাগল ছানার লেজের মতো খানিক নাড়ালো সে। আহলাদে মানুষ তো আটখানা হয় রমাকান্ত হলো তিরিশ চল্লিশখানা। এই একখানা সাপের মতো সাপ হওয়া গেছে। বেশ ভদ্র। বেশ বনেদি। দেখলে যে কেউ মুগ্ধ হবে। চোখ জুড়িয়ে যাবে। নয়নসুখ যাকে বলে। নিজের সৌন্দর্যে এতোটাই মুগ্ধ হলো রমাকান্ত কোনো বিপদের কথাই আর মনে হলো না তার। ঘোড়া এবং কুকুরের চেয়ে সাপের বিপদ যে অনেক বেশি, মাথায়ই ঢুকলো না তার। পনেরো বিশ হাত লম্বা শরীর নিয়ে মহা আনন্দে ঘুমঘুমির মাঠে চড়তে লাগলো।

ততোক্ষণে রোদ উঠে গেছে। গ্রীষ্মকালের বাঘা রোদ। সকালবেলাও বেজায় তেজ রোদের। সাপেরা রোদ সইতে পারে না। রোদ দেখলে ঝোঁপঝাড়ের ছায়া কিংবা গর্তে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু ঘুমঘুমির মাঠে তেমন কোনো ঝোঁপঝাড় নেই। অতো বড়ো দেহ নিয়ে ঢোকা যায় এমন কোনো গর্ত নেই। পাঁচ সাত মিনিটে ঘেমে একেবারে নেয়ে গেলো রমাকান্ত। ফলে মেজাজটা এমন একটা লাফ দিলো, একেবারে তিরিক্ষি হয়ে গেলো। ছায়া দরকার। ছায়া না পেলে, এই রোদে সন্ধে অব্দি থাকলে দেহটা লইট্টা মাছের সুটকি হয়ে যাবে। দেহ ছেড়ে জানটা কোন্ ফাঁকে উধাও হবে টেরই পাবে না রমাকান্ত।

মেজাজ তিরিক্ষি হলে মানুষের মতো ভূতেদেরও বুদ্ধি লোপ পায়। এই একটি ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে বড়ো মিল তাদের। রমাকান্তরও বুদ্ধি কমে গেলো। কি করবে কিছুই বুঝে ওঠতে পারলো না।

রমাকান্ত কি দেবদারু গাছটির কাছে চলে যাবে! দেবদারু তলায় আইসক্রিমের মতো মিষ্টি মোলায়াম একখানা ছায়া পড়ে থাকে চৌপর দিন। সেই ছায়ায় শরীর বিছিয়ে শুয়ে থাকলেই হলো। নাক ডাকিয়ে একখানা ঘুমও হবে, দিনটাও কেটে যাবে।

নাকি নদীতে গিয়ে নামবে!

নদীর জলে শরীর ডুবিয়ে পড়ে থাকবে! শুধু নাকটা জাগিয়ে রাখবে জলের ওপর। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে না? জলের তলায় তো আর শ্বাস প্রশ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ঠাণ্ডার বাই যে! নিউমোনিয়া হবে যে!

নাকি গ্রামের দিকে চলে যাবে রমাকান্ত!

রমাকান্ত আকাশের দিকে তাকালো। রোদ যা ওঠেছে এই রোদে ওই অতোটা পথ যেতেই পারবে না সে। পথেই জানটা খারিজ হয়ে যাবে।

সাপ হওয়ার তো দেখি ম্যালা ঝক্কি!

ধুৎতেরি, সাপ হয়ে থাকবোই না। আমি বাঘ হবো।

সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলে ফেললো রমাকান্ত। বাঘ হয়ে গেলো। তাও যে সে বাঘ নয়, মেছো কিংবা খাটাসের মতো কেঁলো বাঘ নয়, বাঘ হয়েও যেগুলো শুধু কাঁদে। রমাকান্ত হলো খাঁটি সরষের তেলের মতো খাঁটি একখানা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাঘ জিনিসটা যে এতো সুন্দর জানা ছিলো না রমাকান্তর। হলুদ ডোরাকাটা কি সুন্দর শরীর। গায়ের লোম শ্যাম্পু করা চুলের মতো মোলায়েম। শরীরটা দুধে ভেজা পাউরুটির মতো তুলতুলে। পায়ের থাবা সাবানের ফেনার মতো নরম। হাঁটা চলায় একটুও শব্দ হয় না। মুখের ভেতর দাঁতগুলো কি মজবুত! কি ধারালো! চোখ দুটো টর্চলাইটের মতো। নাকের তলায় আছে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের মতো গোঁফ। বাহাবা, বাহাবা।

রয়েল বেঙ্গল রমাকান্তর ভারি একটা ক্ষেমটা নাচ নাচার শখ হলো। নাচটা মাত্র শুরু করবে তার আগেই মনে পরলো জিম করবেট সাহেবের কথা। মনে পড়ায় নাচটা আর নাচলো না সে। জিম করবেটকে বেদম গালাগাল করতে লাগলো। ব্যাটা জিম করবেট তুমি একটা লাটটু, তুমি একটা গোলালু, এতো সুন্দর বাঘগুলো মেরে সাবড়ে নিয়েছো! আদর করে তাদের নিয়ে আবার বই লিখেছো। ফাজলামো, না?

জিম করবেটকে গালাগাল করার ফাঁকেই রমাকান্ত ঠিক করলো জীবনে যদি কখনো কোনো জীবের রূপ ধরতে হয় তাহলে বাঘের রূপই ধরবে। বাঘের কাছে অন্য কোনো জীব জীবই না। মানুষের কাছে কেঁচো যেমন কেঁচো, বাঘের কাছে মানুষ তেমন কেঁচো।

বাঘের অহংকার নিয়ে ঘুমঘুমির মাঠে খুবই রাশভারি ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগলো রমাকান্ত।

সকাল বেলার রোদ তখন আরো তেতেছে। শিকার ধরার আগে বাঘ যেমন ওৎ পাতে তেমন করে ওৎ পেতেছে ঘুমঘুমির মাঠে। রমাকান্ত টের পেলো তার খুব গরম লাগছে। সাপের মতো বাঘেরাও রোদ সইতে পারে না। গরমে রমাকান্তর বাঘ জিভটা আর মুখের ভেতর থাকতে চাইছে না। দুআড়াই হাত পরিমাণ

বেরিয়ে এসেছে। এমন লটর পটর করে ঝুলছে জিভটা দেখে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলো রমাকান্ত। ভেতরে ভেতরে মেজাজ ততোক্ষণে তিরিক্ষি হতে শুরু করেছে তার। আর মেজাজ তিরিক্ষি হলেই বুদ্ধি লোপ। আর বুদ্ধি লোপ পেলে বাঘ হওয়ার ঝক্কি ঝামেলার কথা মাথায়ই আসবে না। যা ভাববার এখুনি ভেবে নিতে হবে।

ভাবনা শুরু করতে না করতেই ভয়ে আতংকে বুকখানা শুকিয়ে একেবারে ঘুমঘুমির মাঠ হয়ে গেলো রমাকান্তর। দিনের আলোয় চোখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে একখানা বাঘ। তাও যে সে বাঘ নয় একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দৃশ্যটি একজন মানুষের চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়বে দিকবিদিক। মানুষ সমাজে খবর হয়ে যাবে। আর খবর হওয়া মানে সাড়া পরে যাওয়া। পৃথিবীতে মানুষের তো আর শত্রুর অন্ত নেই। ছোট মাঝারি বড়ো নানা সাইজের শত্রু। বাঘ জিনিসটি পড়ে বড়ো শত্রুর পর্যায়ে। যদিও মানুষের সবচে বড়ো শত্রু মানুষই। তবু শত্রু হিশেবে বাঘের একটি আলাদা মর্যাদা আছে। হাতের কাছে বাঘ পেলেই নিজেদের শত্রুতার কথা ভুলে যাবে মানুষ। চরম শত্রুরাও বন্ধু হয়ে যাবে। লাঠি সোটা সরকি বল্লম আর বন্দুক নিয়ে চারদিক থেকে আক্রমণ চালাবে। ব্যাপারটা গিয়ে পড়বে একেবারে উৎসব আনন্দের পর্যায়ে। জানটা যাবে কেবল রমাকান্তর। সরকি বল্লমের ঘা যাও বা একটা সহ্য করা যাবে বন্দুকের গুলি সহ্য করা যাবে না। একবার ঠুস করলেই ভূত জীবনটি ফুস হয়ে যাবে।

কি করা যায়?

ভারি একটা চক্করে পড়ে গেলো রমাকান্ত। দিনের আলোয় বেঁচে থাকা তো দেখি মহা মুশকিল! পথ তো হারিয়েছিই এখন তো দেখি জানটাও হারাবো!

বাবাগো মাগো করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো রমাকান্তর। আর তখনি শেষ বুদ্ধিটা এলো মাথায়। একটাই পথ আছে এখন সে হলো মানুষ হওয়া। মানুষের রূপ ধরা। মানুষের রূপ ধরলে আর কোনো বিপদ নেই। আরামসে দিনটা পার করা যাবে। মানুষ তো আর মানুষের পিঠে ঘোড়ার মতো চড়বে না! মানুষ তো আর কুকুর ভেবে মানুষকে ঢিল ছুঁড়বে না! কিংবা নেড়িকুত্তারাও দল বেঁধে আক্রমণ করবে না মানুষকে। রমাকান্ত তো আর চোর ছ্যাচর হচ্ছে না। গায়ে শক্তি যতো কমই থাক, মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে ভয় পায় না এহেন জীব পৃথিবীতে নেই। সাপ বাঘ পর্যন্ত মানুষের ভয়ে লোকালয়ে থাকে

না। থাকে বনে বাঁদাড়ে। মানুষের আওয়াজ পেলে জান নিয়ে ছুটে পালায়। সার্কাসের মানুষগুলো বাঘাবাঘা বাঘগুলোকে ধরে পোষ মানায়। ইয়া ইয়া অজগরগুলোকে মোটা দড়ির মতো ধরে টানাটানি করে। অতোবড়ো যে হাতিগুলো মানুষ তারও পিঠে চড়ে বসে। সিংহগুলোকে চাকর বাকরের মতো খাটায়।

বাহাবা বাহাবা।

মানুষ হওয়ার বুদ্ধিটা এতোক্ষণ মাথায় আসেনি কেন রমাকান্তর! সেকি গাধা নাকি!

থাক নিজেকে গালাগাল করে আর লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিটা যে এসেছে মাথায় এই যথেষ্ট। গালাগাল বাদ দিয়ে নিজের বুদ্ধির খুবই তারিফ করতে লাগলো রমাকান্ত। এমন কি নিজের একখানা হাত অন্যের হাতের মতো করে অনেকক্ষণ ধরে পিঠে এবং মাথার পেছন দিকে বুলালো। মুরুব্বিরা ছোট ছেলেমেয়েদের আদর স্নেহ করার সময় যেমন করে হুবহু তেমন করে নিজেকে বললো, না না না কে বলেছে তুমি বোকা! কে বলেছে তুমি গাধা! গাধার মতো বেয়াকুব জন্তু তুমি হতে যাবে কেন! তুমি হচ্ছো বেশ ভালো, বেশ বুদ্ধিমান একখানা ভূত।

তারপরই মানুষের রূপ ধরলো রমাকান্ত। রূপ ধরার সময় এতোটাই তাড়াহুড়ো করছিলো সে ফলে বেশ বড়ো রকমের একটা ভুল হয়ে গেলো তার। পুরুষ মানুষ নয় সে ধরে ফেলেছে স্ত্রীলোকের রূপ। তাও একেবারে খুনখুনে এক বৃদ্ধা হয়ে গেছে।

খুনখুনে গ্রাম্য বৃদ্ধাদের চেহারা তেমন সুবিধের হয় না। শরীর হয় খুবই জীর্ণ শীর্ণ। হাত পা গাছের মরা ডালপালার মতো। মাথার চুল পাটের আঁশের মতো শাদা ধপধপে। মুখটা ভাংগাচোরা শামুকের মতো। চোখ দুটো পচা লিচুর মতো ঘোলা। সেই চোখে দৃষ্টি এতো কম, কোনো কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। যে কোনো দৃশ্যের ওপরই পাতলা শাদা কাপড়ের একটা পর্দা পড়ে থাকতে দেখা যায়। কানের ভেতর মনে হয় সারা জনমের খোল জমে আছে, জীবনে কখনো কান পরিষ্কার করা হয়নি। সারাক্ষণ ভোঁ ভোঁ একটা আওয়াজ হতে থাকে কানের হাড়িতে। কোনো শব্দই স্পষ্ট শোনা যায় না। নিজেকে মনে হয় বয়রা। চোখ কান দেখার পর মুখের ভেতরটা দেখতে লাগলো রমাকান্ত। হায় হায় মুখের ভেতর তো দেখি একটিও দাঁত নেই। পচা নারকেলের মতো ফোকলা।

জিভখানাও এমন ভারী, সহজে নড়ানো যায় না।

বিরক্ত হয়ে পুরো শরীরটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো রমাকান্ত। বয়সের ভারে শরীরটা একেবারে ধনুকের মতো বাঁকা। চামড়ার ওপর ম্যালা হিজিবিজি দাগ। যেনো বলপেনে কালি আছে কিনা দেখার জন্য কোনো বাচ্চা ছেলে চামড়াটিকে খাতার কাগজ মনে করে অবিরাম ঘষাঘষি করেছে। চামড়াটা শরীরে লেগেও আছে এমন করে, যেনো রঙচটা ভেজা একখানা কাপড় জলে চুবিয়ে খুব করে চিপড়ে গায়ে লেপটে দিয়েছে কেউ। সামান্য হাওয়ায় গায়ের চামড়া ঝুলঝুল করে।

মেজাজটা বিগড়ে গেলো রমাকান্তর। ধুৎতেরি! এটা কোনো মানুষের চেহারা হলো বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি। এই চেহারার মানুষ হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভালো।

খুনখুনে বুড়ির রূপটা বদলে ফেললো রমাকান্ত। পুরুষ মানুষ হয়ে গেলো।

কিন্তু এবারও বিপত্তি। পুরুষ মানুষ হলো সে ঠিকই কিন্তু হলো বেজায় মোটকা আর হোৎকা। একদম হাতির মতো। পা দুটো হলো প্রায় দেবদারু গাছের গুড়ি। প্রথমেই নিজের পায়ের দিকে তাকালো রমাকান্ত। সামান্য একটুখানি হাঁটলো। হেঁটে তার নিজেরই মনে হলো না এ কোনো মানুষ হাঁটছে, মনে হলো হাঁটছে দুটো দেবদারু গাছ।

ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হলো না রমাকান্তর। নিজের হাত দুটোর দিকে তাকালো সে। সে দুখানাও বেশ একটা দেখার বস্তু হয়েছে। ডালপালাহীন মাঝারি সাইজের দুখানা কদম গাছ যেনো। একেক হাতের পাঁচটি করে আঙুল যেনো পাঁচটি করে কলাগাছ। আঙুলের ডগায় বসানো নখগুলো যেনো চাল ঝাড়ার একেকখানা কুলো। পেটখানার তো কোনো তুলনাই হয় না

এসব দেখার পর নিজের মুখখানা দেখার ভারী সাধ হলো রমাকান্তর। কিন্তু নিজের মুখ নিজে দেখবে কেমন করে। অতো বড়ো আয়না পাবে কোথায়!

রমাকান্ত নদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নদীর জলটা তো আয়নার মতোই। ঝুঁকে দাঁড়ালে পুরো চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়।

রমাকান্ত ঝুঁকে দাঁড়ালো। মুহূর্তে জলের ভেতর জেগে উঠলো তার চেহারা। সেই চেহারা দেখে রমাকান্তর মনে হলো এতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো সে আর সেই ফাঁকে পথভুলো একটা টিকটিকি ঢুকে গেছে তার কানে। বাবারে গেছিরে বলে পেল্লায় একখানা চিৎকার দিয়ে ধরফর করে উঠে বসেছে সে।

ছ্যা ঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ এটা কোনো মানুষের চেহারা হলো! এতো জঘন্য চেহারা তো

ভূতেদেরও হয় না!

রমাকান্তর বাপ মরাকাটি হচ্ছে ভূতগাঁয়ের সবচাইতে বদখত চেহারার। মরাকাটিকে দেখলে গাঁয়ের ভূতেরা সব ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে। কিন্তু তেনার চেহারাও তো এতো খাতারনাক নয়।

নদীতীরে দাঁড়িয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে গেলো রমাকান্ত। না এভাবে হবে না। শেষ একটা চেষ্টা করতে হবে। এবার ভদ্রলোকের রূপ ধরতে পারলে ধরবে নয়তো ভূত হয়েই ঘুমঘুমির মাঠে বসে থাকবে। যা হবার হবে।

এবার আর পরিশ্রম বেশি করলো না রমাকান্ত। তার যা বয়স অবিকল সেই বয়সটা রেখে ভূতের চেহারা শরীরের জায়গায় কেবল মানুষের চেহারা শরীর ফিট করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য বালক হয়ে গেলো রমাকান্ত। কালো কোলো গায়ের রঙ। ডাগর দুখানা চোখ। মুখখানা মিষ্টি, মায়াবী। মাথায় এলোমেলো ফুরফুরে চুল। খালি গা। পরনে ছেঁড়াখোড়া নীল ডুরে লুঙ্গি। নিজেকে দেখে কি যে মায়া লাগলো রমাকান্তর। আরে এতো সোজা সুন্দর মায়াবী একখানা রূপ ফেলে এতোটা সময় ধরে সে কিনা ওসব ফালতু চেষ্টা চালিয়ে গেলো! সেকি গাধা নাকি!

নিজেকে বেশ একচোট গালাগাল করলো রমাকান্ত। তারপর হাত পা ছড়িয়ে নদীতীরে বসে পড়লো। ভারি টায়ার্ড লাগছে। যেনো তেনো ধকল তো আর যায়নি! টায়ার্ড লাগবে না!

কিন্তু নদীতীরে খানিক বসে থাকার পর মনটা খারাপ হয়ে গেলো রমামান্তর। তার খুব মা বাবার কথা মনে পড়লো। দিনের আলো ফুটে ওঠেছে, সে বাড়ি ফেরেনি। মা বাবা নিশ্চয় ব্যাকুল হয়ে গেছে। রমাকান্তর মায়ের নাম সীপরু। তার স্বভাব হচ্ছে কথায় কথায় ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদা। ভূতগাঁয়ে সীপরুর মতো ছিচকাঁদুনে পেত্নি আর একটিও নেই। এতোক্ষণে কান্নাকাটি করে ঘরদোর নিশ্চয় ভাসিয়ে ফেলেছে সে। খোনা গলায় থেকে থেকে হয়তো বিলাপ করছে, আঁহাঁরে আঁমাঁর মাঁনিকঁরেঁ, কোঁথাঁয় চঁলেঁ গেঁলিঁরেঁ।

মায়ের কান্নার কথা ভেবে রমাকান্তরও খুব কান্না পেলো। নদীতীরে হাত পা ছড়িয়ে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো সে।

সোনারঙ গাঁয়ের লালটুর কেতাবি নাম লালটু মহারাজ। এ রকম অদ্ভুত একটা নাম কে যে রেখেছিলো লালটু জানে না। জন্মের আগে বাপ মরেছে, জন্মের সময় মা। সুতরাং পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে আপন বলতে কাউকে দেখনি লালটু। খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে সোনারঙ বাদ্যকর বাড়িতে এসে ওঠেছে। বাদ্যকরদের একপাল গরু। লালটু মহারাজ গরুদের তদারক করে। ঘুমঘুমির মাঠে নিয়ে চড়ায়। এগারো বারো বছর বয়সে পুরোদস্তুর রাখাল সে। তবে লালটু মহারাজ দেখতে ভারি সুন্দর। গায়ের রঙখানা ফরসা নয়, কালো কোলো। চোখ দুখানা বেশ ডাগর। মুখখানা মিষ্টি, মায়াবি। মাথায় এলোমেলো ফুরফুরে চুল। কৃচিৎ কখনো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখতে পেলে নিজের জন্যে ভারি মায়া হয় লালটুর। আহা এরকম মায়াবি চেহারা নিয়ে সে কিনা হয়েছে বাদ্যকরদের রাখাল। এগারোটি ডাকরা গরু ঘুমঘুমির মাঠে নিয়ে একাকী চড়ায়।

বাদ্যকরদের কাজ হচ্ছে দেশগ্রামের উৎসব আনন্দে, পালা পার্বণে, বিয়ে শাদীতে ঢোল ডগর বাজানো। সানাই খঞ্জনী বাজানো। শহরে যেমন ব্যাণ্ডপার্টি গ্রামে ওই জিনিসেরই নাম বাদ্যকর। মানুষের মধ্যে উৎসব আনন্দ, বিয়ে শাদী তো লেগেই থাকে। আজ এ গাঁয়ে কাল ও গাঁয়ে। সুতরাং বাদ্যকরদের আড্ডার নেই। প্রতিদিনই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দল বেঁধে বেরোয় তারা। তবে বেরোয় অনেকটা বেলা করে। দুপুরের মুখে মুখে। ফেরে সন্ধের পর।

অতোটা বেলা করে বেরুবার কারণ বাদ্যকররা রাতের বেলা ঘুমোয় না। সারারাত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রাকটিস করে। নতুন নতুন সুর তোলে। নতুন সুর না তুললে একঘেয়ে বাজনা কতোকাল শুনবে লোকে। সুতরাং রাতভর জেগে নতুন সুর তুলে ঘুমোতে যায় ভোরবেলা, গাঁয়ের মোয়াজ্জিন যখন ফজরের আজান দেয়, তখন। দুপুর নাগাদ ওঠে গোসল টোসল করে তারপর যাত্রার রাজা বাদশাদের মতো জরিদার আচকান পাজামা পরে, কাঁধে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেরোয়। নিজেদের বাড়িতে কিন্তু পুরুষ মানুষরা কেউ খায় না। না দুপুরে না রাতে। যে বাড়িতে বাজাতে যায় সেখানেই দুবেলার আহার। সকালের নাস্তা বলে তো কিছু নেই। সকালে তো তারা ওঠেই না।

তবে প্রতিদিন বিয়ে বাড়িত খাবার খেয়ে খেয়ে বাদ্যকরদের চেহারা সুরত হয়েছে দেখার মতো। তাগড়াই গড়ন একেক জনের। সাধারণ তিনজন মানুষ মিলে তারা হবে একজন। এ বাড়ির যে কোনো পুরুষ মানুষের সামনে দাঁড়ালে লালটু মহারাজকে মনে হয় তেলাপোকার সমান।

তবে বাড়ির মেয়েগুলো বড়ো শুটকো। টিকটিকির মতো হাড় জিরজিরে শরীর একেক জনের। জোরে বাতাস দিলে ঘুড্ডির মতো কাল্লি খায় কেউ গোত্তা খায় কেউ। আর প্রতি শীতেই একজন দুজন করে পটল তোলে। ফলে শীতকাল আসার আগেই বাড়ির মহিলাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, পটলটা এবার কে কে তুলবে?

বাদ্যকর বাড়িতে লালটু টিকে আছে মহিলাদের জন্যেই। তারা সবাই ভারি আদর করে লালটুকে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর লালটু যখন গরু চড়াতে বেরোয় গামছার পোটলায় গুড় মুড়ি বেঁধে দেয় তারা। এতোগুলো করে দেয়, সকাল দুপুর এমনকি সন্ধেবেলা ফেরার সময় অব্দি খেয়ে ছাড়াতে পারে না লালটু। রাতের বেলা ভাত দেয় তিন মানুষের সমান। একা অতো খাবার কি খাওয়া যায়! তিন ভাগের একভাগ খায় লালটু। বাকিটা পড়ে থাকে। বাড়ির পুরুষগুলো লালটুর দিকে ফিরে তাকায় না ঠিকই তবে লালটু আছে বেশ। খায় দায় গরু চড়ায় আর ঘুমোয়। এই বাড়িতে আসার পর ভারি মজাদার একটি ঘুমের ওষুধ পেয়েছে সে। ওষুধটা হচ্ছে ওইসব বাদ্যযন্ত্র। ঢোল ডগর, সানাই খঞ্জনি।

বাদ্যকররা বাড়ি ফেরার আগেই গরুর পাল নিয়ে ফেরে লালটু। গরুগুলোকে গোয়ালে বেঁধে নিজে একদম ঝাড়া হাতপা হয়ে যায়। তারপর যখন খেতে বসে তখনি বাড়ি ফেরে বাদ্যকররা। লালটুর খাওয়াও শেষ তারাও বসে প্রাকটিসে। লালটুর দিকে তারা যেমন ফিরেও তাকায় না লালটুও তাদের তেমন পাত্তা দেয় না। গোয়াল ঘরের পাশে ছোট্ট একটা কুঁড়ে। মেঝেতে এক গাদা খড় ফেলে তার ওপর পাতা আছে খেজুর পাতার একখানা হোগলা। ভারি আরামদায়ক বিছানা। এই বিছানাটি লালটুর। কুঁড়েটিও তার একার।

একা ঘুমোতে লালটু কিন্তু একদমই ভয় পায় না। তার কখনো মনেই হয় না সে একা। পাশেই তো গোয়াল। সেখানে এগারোখানা গাই গরু। দিনের বেলা ঘুমঘুমির মাঠে লালটুর সারাক্ষণের সঙ্গী তারা পাশাপাশি থাকে। রাতের বেলাও সেই একই অবস্থা। পাশাপাশি ঘরে থাকা। সুতরাং ভয় লালটু পাবে কেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে লালটু যখন নিজের বিছানায় এসে শোয় বাদ্যকররা তখন ধুম প্রাকটিস শুরু করে। তাদের ঢোলে একটি করে বাড়ি পড়ে আর লালটুর একটু করে ঘুম আসে। যখন একত্রে বাজাতে শুরু করে সব যন্ত্র লালটু তখন গভীর ঘুমে। ভোরবেলা বাদ্যকররা যখন প্রাকটিস থামায়, যে মুহূর্তে যন্ত্র থামে ঠিক সেই মহূর্তেই ঘুম ভেঙে যায় লালটুর। এক সেকেণ্ডও দেরি হয় না।

কিন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছাড়ে না লালটু। গোয়ালের এগারোটা গরুর মধ্যে একটা আছে ঐঁড়ে। এবার তিনবছরে পড়েছে। এই বয়সেই বেজায় তাগড়া সে। বড়োদের একদম মান্যগণ্য করে না। বেয়াদপি দেখলেই ঢুসোঢুসি শুরু করে। ফলে সে হয়েছে গরুদের লিডার। ছোট বড়ো প্রত্যেকেই তাকে ভারি সমীহ করে। কারো দিকে চোখ তুলে তাকালে, যার দিকে তাকায় তার হাম্বা ডাক বন্ধ। বাছুরগুলোর তিড়িং বিড়িং লাফ বন্ধ। গায়ের রঙ খয়েরি বলে লালটু তার নাম দিয়েছে খয়রা। এই খয়রা হচ্ছে লালটুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একমাত্র লালটুকেই সে সম্মান করে। পিঠে করে ঘুমঘুমির মাঠে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। দলের লিডারই যেখানে এতো মান্য করে সুতরাং অন্য দশটা গরু লালটুকে যমের মতো ভয় পায়। গরু চড়াতে লালটুর কোনো পাচনবাড়ি, মানে লাঠি লাগে না। লালটু মুখ দিয়ে সামান্য আওয়াজ করলেই তেড়িবেড়ি বন্ধ হয়ে যায় তাদের। সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরও লালটু কিন্তু বিছানা ছাড়ে না এই খয়রার জন্য। খয়রার ঘুম ভেঙেছে কিনা বোঝার জন্য অপেক্ষা করে। সে অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য নয়। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। গরুদের মধ্যে একমাত্র খয়রার ভাষাটাই বোঝে লালটু। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে লালটুকে ডাকে খয়রা। মহারাজ, ওঠেন ওঠেন, বিহান হয়েছে। বয়স কম বলে ভাষাটা এখনো ঠিক হয়নি খয়রার। সে বিয়ানকে বলে বিহান। যাহোক খয়রার ডাকে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে লালটু। তারপর গামছায় গুড়মুড়ি বেঁধে খয়রার পিঠে চড়ে খয়রা চলে আগে আগে, পিঠে মহারাজ। পেছনে চাকর বাকরের মতো অন্য দশটি গাইগরু। যখন নদীতীরে এসে পৌঁছয় তারা তখন দিনের সূর্য ঠেলে ঠুলে বেশ খানিকটা ওঠে যায়।

আজও তাই হয়েছে।

কিন্তু নদীতীরে এসেই গরুগুলো জীবনেও যা করে না আজ তাই করলো। সার ধরে দাঁড়িয়ে গেলো। কিছুতেই নদী পার হবে না। নাকমুখ দিয়ে অচেনা ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরুচ্ছে তাদের। শব্দটা ভয়ের না রাগের কিছু বোঝা যায় না। খয়রা নিজেও একই আচরণ করছে।

লালটু খুবই অবাক হলো। ব্যাপার কি! খয়রাকে জিজ্ঞেস করলো, কিরে খয়রা, কি হয়েছে? নদী পেরুচ্ছিস না কেন? ভয় পাচ্ছিস কেন? ওইটুকুই তো জল। তোদের তো খুরও ডোবে না!

খয়রা দুর্বোধ্য ভাষায় গো গো করে কি বললো কিছুই বুঝতে পারলো না লালটু। তার মনে হলো খয়রা বোধহয় বলছে আপনি আগে যান মহারাজ। আমরা

আসছি।

কিন্তু কেন এমন কথা বলছে! কোনোদিন তো এমন কথা বলে না, এমন আচরণও করে না। লালটুকে পিঠে নিয়েই তো নদী পেরোয়।

প্রথমে একটু রেগে ওঠতে চাইলো লালটু। ভাবলো পেল্লায় একখানা ধমক দেবে খয়রাকে। কি ভেবে দিলো না। শুঙ্ক মুড়ির পোটলাটা খয়রার পিঠের ওপর ঠোঁচের সঙ্গে প্যাচ দিয়ে রেখে লাফ দিয়ে পিঠ থেকে নামলো। তারপর কোনো কথা না বলে নদী পেরিয়ে গেলো। লালটুর ধারণা ছিলো তার পিছুপিছু গরুরাও নদীতে নামবে, নদী পেরিয়ে আসবে। কিন্তু ওরা যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। একটুও নড়লো না।

কী ব্যাপার!

ওপারে এসে গরুদের দিকে মাত্র ফিরে তাকাবে লালটু তার আগেই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠলো। একি আরেকজন লালটু মহারাজ যে বসে আছে নদীতীরে! অবিকল লালটুর মতো মুখখানি। কালো কোলো গায়ের রঙ। ডাগর দুখানা চোখ। মাথায় ফুরফুরে চুল। খালি গাখানিও তো লালটুরই! পরনের নীল ডুরে, ছেঁড়া খোড়া লুঙ্গিটাও তো!

এ কি করে সম্ভব!

লালটুর প্রথমে মনে হলো সে বুঝি বড়ো একখানা আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের পুরো শরীর দেখতে পাচ্ছে আয়নায়।

দুহাতে চোখ ডলে ভালো করে তাকালো। সামনে আয়না আছে কিনা হাত বাড়িয়ে দেখতে চাইলো। না তো! আরে সে একা দুজন হয়ে গেলো কি করে? কোন ফাঁকেই বা চলে এলো এখানে?

লালটুর চোখে পলক পড়ে না। ফ্যাল ফ্যাল করে আরেকজন লালটুর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

এ আসলে রমাকান্ত। ভূত থেকে মানুষের রূপ ধরে এরকম হয়ে গেছে সে। কিন্তু রূপ ধরার আগে বুঝতে পারেনি কার মতো হচ্ছে। ফলে লালটুকে দেখে রমাকান্তও কিন্তু কম অবাক হয়নি। তার চোখেও পলক পড়ছিলো না। সেও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লালটুর দিকে। এ কি কাণ্ড! সে একা একটি ভূত দুটি হলো কি করে! এ আবার কোন ভূত!

লালটু অবাক গলায় বললো, এই তুমি কে?

রমাকান্তর বেশ মজা লাগছে। এতোক্ষণ ধরে মায়ের জন্য কাঁদছিলো, কান্নাটা একদম ভুলে গেলো। একই রকম দুটো ভূত ভূতজন্মে দেখেনি সে। বাড়ির পথ হারিয়ে তো দেখি ভালোই হয়েছে। নিজের মতো আরেকটি ভূত পাওয়া গেছে। আনন্দে একবারে গদগদ হয়ে গেলো রমাকান্ত। খিখি খিখি করে হাসতে লাগলো।

অন্য সময় এভাবে কাউকে হাসতে দেখলে লালটু নিজেও হেসে ফেলতো। এখন হাসলো না। মেজাজটা বিতিকিচ্ছিরি হয়ে আছে। খয়রারা নদী পার হচ্ছে না, ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। এপার লালটুর মুখোমুখি বসে আছে আরেকজন লালটু। সে একা গেছে দুজন হয়ে। দুনম্বর লালটুটি আবার খিখি করে হাসছে। মানুষ হাসে হিহি করে, এ কেন খিখি করছে!

ঠিক বিরাশি কেজি ওজনের একখানা ধমক দিলো লালটু। ভূতের মতো হাসছো কেন? কে তুমি?

হঠাৎ করে এই সাইজের একখানা ধমক, রমাকান্ত ভূত হলে হবে কী তারও তো ডর ভয় আছে, কুকরে মুকরে সে একেবারে কেঁচু হয়ে গেলো। খিখি হাসি কোথায় উধাও হলো, মনো হলো ভূতজন্মে সে কখনো হাসেইনি। হাসি কাহাকে বলে জানেই না। একটু মায়া মায়া, একটু আদুরে আদুরে মুখ করে লালটুর দিকে তাকিয়ে রইলো। ফাঁক মতো গোটা তিন চারেক ঢোকও গিললো। কারণ গলাটা তার শুকিয়ে আমড়া কাঠের ঢেঁকি হয়ে গেছে। Mango hope (আম+আশা) রোগীর মতো, অবিরাম বাথরুমে আসা যাওয়া গলায় বললো, ইয়ে আমি রমাকান্ত কামার। বলতে চেয়েছিলো আজ্ঞে আমি রমাকান্ত কামার, ভয়ে আজ্ঞেটা ইয়ে হয়ে গেলো।

কিন্তু নিজের সাইজের কারো এরকম খটোমটো নাম হতে পার জানা ছিলো না লালটুর। নামটা শুনে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা ল্যাং খেয়েছে। মেজাজ ভালো থাকলে হাসতে হাসতে ভিড়মি খেতো। এখন খেলো ল্যাং। তবে মেজাজ খারাপ থাকলে ভালো কথায়ও লালটু বেশ তেড়িবেড়ি করে। স্বভাব। রমাকান্ত নিজের নাম বলেছে অন্যায় তো কিছু করেনি, লালটু তবু ধমক দিলো। ভুরু দুটো ট্যাংরা মাছের মতো করে, বয়রা মানে কানে কালা লোকরা কোনো কথা শুনে বুঝতে না পারলে যেমন খেকুড়ে গলায় চিৎকার করে অবিকল তেমন গলায় বললো, কী নাম?

ইয়ে রমাকান্ত। রমাকান্ত কামার।
এটা কোনো মানুষের নাম হলো?
এবার ইয়েটা আজ্ঞে হলো। অতিশয় বিনয়ের গলায় রমাকান্ত বললো, আজ্ঞে না মানুষের নাম না। ভূতের। আমি ভূত। ভূত রমাকান্ত।
নিজেকে কেউ ভূত বলছে শুনলে কার না হাসি পায়! লালটুরও পেলো। রাগটা একেবারে নদীর জল হয়ে গেলো তার। দুনম্বর জিনিসটি তো দেখি মহা সরেস। বেশ হাসাতে জানে।
রমাকান্তর সামনে ঠিক রমাকান্তর মতো করে বসলো লালটু। দেখো আমার খুব মেজাজ খারাপ। বাইচলামি করো না।
বাইচলামি কথাটা কেমন চেনা চেনা লাগলো রমাকান্তর। কোথায় যেনো শুনেছে! নাকি ঠিক এই কথাটি শোনেনি এর কাছাকাছি কিছু একটা শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বাংলাভাষায় ফাজলামো বলে একটা কথা আছে। ঢাকাইয়া কুট্টিরা ফাজলামোকে আদর করে বলে বিতলামি। বিতলামি কথাটা মরাকাটির কাছে শুনেছে রমাকান্ত। মরাকাটি (টিকারাম) এক সময় মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতো। মিষ্টির লোভে কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে চলে যেতো। একবার রাত দুপুরে চলে গেলো ঢাকায়, নরমনাচ না কি যেনো এক ময়রার মিষ্টির খুব নামডাক শুনেছে সে। সেই মিষ্টি না খেলে জীবন বরবাদ। ঢাকায় গিয়ে নরমনাচের দোকানে মাত্র ঢুকতে যাবে দেখে দোকানের ঘুমকাতুরে কর্মচারিটা সাটার নামাচ্ছে। দোকান বন্ধের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু মরাকাটির মিষ্টির লোভ। ভূতগাঁ থেকে এই এতোদূর এসেছে সে, মিষ্টি না খেয়ে যায় কী করে! সাটার অর্ধেকটা মাত্র নেমেছে, মরাকাটি করলো কী এক হাতে সাটার ঠেলে ধরলো, কর্মচারী সাটার টেনে নামাতে চায় সাটার তো আর নামে না। বেচারার ঘুমটুম মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। সে টের পাচ্ছে দৈত্যের মতো শক্তিশালী কেউ সাটার ওপরের দিকে ঠেলে রেখেছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। মরাকাটি ধারিভূত। সে হাওয়ায় মিশে থাকতে পারে। কর্মচারী তাকে দেখবে কোত্থেকে! তবে বেচারা যারপরনাই বিরক্ত হলো। ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষায় বললো, আবে কেউগা বিতলামি করে?
বিতলামি শব্দটা শুনে এমন হাসি পেলো মরাকাটির, সে খুবই বদখত ভূত, হাসে একেবারে খ্যাকশেয়ালের মতো করে। এখনো তাই করলো, খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলো

লোকজনের চিহ্ন নেই কিন্তু খ্যাক খ্যাক একটা হাসির শব্দ, ঘুমকাতুরে নির্বোধ কর্মচারিটা তবু বুঝতে পারে না বিষয়টা কী। আবার বলে, আবে কেউগা বিতলামি করে?
পরে বউ বাচ্চার কাছে বিতলামি কথাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছে মরাকাটি। বাইচলামি কথাটা বোধহয় বিতলামির মতোই কিছু একটা হবে। রমাকান্তর তলপেট থেকে আবার হাসি ঠেলে উঠলো। কিন্তু হাসিটিকে গলা অব্দি পৌঁছতে দিলোনা সে। বুকের কাছে আটকে রাখলো। হেসে আবার ধমক খাবে নাকি। রমাকান্ত কাদার মতো নরম গলায় বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?
নদীর ওপারে দাঁড়ানো গরুগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা গলায় লালটু বললো, বলো।
তোমার মেজাজ খারাপ কেন?
খয়রারা সব ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, নদীপার হচ্ছে না। আগে কোনোদিন এমন করেনি। আজই করছে।
আজ তো করবেই। ওরা যে আমাকে দেখেছে!
তাকে কী হয়েছে?
রমাকান্ত লাজুক গলায় বললো, গরুরা খুব সহজে চিনতে পারে। অতোদূর থেকে দেখেও আমাকে ওরা ঠিক চিনে ফেলেছে।
তোমাকে আবার চেনার কি হলো! তুমি তো আমার মতোই।
না আমি তো ভূত। তোমার মতো রূপ ধরেছি।
আবার চাইচলামি! দেখো, আমি কিন্তু তোমাকে চড় মারবো।
মেরে লাভ হবে না। চড়টা তোমার নিজের গালেই লাগবে।
কিসব কথা বলছো। তুমি কি পাগল?
না আমি ভূত।
এবার রাগ আর সামলাতে পারলো না লালটু। ডানহাতে বেশ একটা চড় মারলো রমাকান্তর গালে। কিন্তু চড়টা লাগলো তার নিজের ডান গালে। লালটু একেবারে থতমত খেয়ে গেলো। একি কান্ড! নিজের এতো বড় চড় নিজের গালে! এমন তো কখনো হয়নি।
দৃশ্যটি খুবই হাসির। কিন্তু রমাকান্ত হাসলো না। নিজের চড়টি বেশ খেয়েছে লালটু। এসময় হাসলে ধুন্দুমার কান্ড হয়ে যাবে।
লালটুকে সহানুভূতি দেখবার জন্য ঠোঁটে চুকচুক একটুখানি শব্দ করলো

রমাকান্ত। তারপর বললো, গরুদের জন্যে মন খারাপ করো না। এখুনি ব্যবস্থা করছি। আমরা যেখানে বসেছি এখানে প্রচুর দূর্বাঘাস। আমি এই ঘাসের ভেতর লুকোচ্ছি, তুমি গরুদের ডাকো। আমাকে দেখতে না পেলেই ওরা চলে আসবে।
লালটু খেকড়ে গলায় বললো, এই ঘাসে তো একটা ঘাসফড়িংও লুকোতে পারবে না, দেখা যাবে। তুমি কি পাগল!
না, বললাম যে আমি ভূত। ঘাসফড়িং পারুক না পারুক আমি পারবো।
সঙ্গে সঙ্গে লালটু তার চোখের সামনে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলো। দুনম্বর লালটুটি ঘাসফড়িংয়ের চেয়েও ছোট হয়ে গেলো। তার হাত পা গুলো হলো শুকনো দূর্বাঘাসের মতো। মাথাটা মশার চোখের সমান। তারপর ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো হেঁটে হেঁটে দূর্বাঘাসের ভেতর উধাও হয়ে গেলো রমাকান্ত। যেতে যেতে বললো, এবার গরুদের ডাকো। ওরা চড়তে যাওয়ার পর আমাকে ডেকো। তোমার সঙ্গে আড্ডা দেবো। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।

ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটলো, লালটু খানিক বুঝতেই পারলো না কী হয়েছে। এই মাত্র আরেকজন লালটু তার মুখোমুখি বসেছিলো, চোখের পলকে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো সে। অন্য সময় হলে বিষয়টি নিয়ে যারপরনাই চিন্তা ভাবনা করতো লালটু। এখন চিন্তা ভাবনার সময় নেই। খয়রারা আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপারে। এপার থেকেও খয়রার চোঁচের সঙ্গে প্যাচ দিয়ে রাখা গুড় মুড়ির পোটলাটা দেখতে পেলো লালটু। এতো তাড়াতাড়ি লালটুর কখনো খিদে পায় না। আজ পেলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সে। খয়রার দিকে হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে বললো, হেই খয়রা, আয় বাহে। আয়। আর দিগদারি করিসনে।
এটা আসলে লালটুর ভাষা নয়। সে কথা বলে ভদ্রলোকের ভাষায়। কিন্তু মেজাজ খারাপ হলে কিংবা খুব বিরক্ত হয়ে থাকলে ভাষার ঠিক থাকে না লালটুর। মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে। ভদ্রলোকের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ঢাকাইয়া ভাষা। নোয়াখালির সঙ্গে মিশায় কোলকাতাইয়া। রংপুর দিনাজপুর এলাকার বাহে কথাটা কোত্থেকে যে এ সময় মাথায় এলো তার! আর এই যে দিগদারি না যেনো কী। ঢাকাইয়া খোট্টাই। কুট্টিরা বলে। মানে হচ্ছে বিরক্ত।
লালটুর চরিত্রের এই দিকটির কথা খয়রার বেশ জানা। ভাষা নিয়ে তার কোনো

মাথা ব্যাথা নেই। তবে নদীর ওপারে ভোর সকালে লালটু মহারাজের রূপ ধরে তেনাদের একজনকে বসে থাকতে দেখে মাথা তো বটেই পেটও ব্যথা করতে শুরু করেছে তার। এই মাত্র চোখ দুটোও কেমন ব্যথা করছে। কারণ এতোদূর থেকেও সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে চোখের পলকে পায়ের তলার দূর্বাঘাসের ভেতর মিলিয়ে গেলেন তিনি। এসব দেখে চোখ ব্যথা না করে পারে!
তবে মহারাজের সাহস দেখে খয়রা একেবারে তাজ্জব বনে গেলো। খুবই গৌরব বোধ করতে লাগলো। মুখোমুখি বসে কী রকম একখানা ধমক দিলো তেনাকে। চড়ও মারলো যদিও চড়টা লেগেছে, যাকগে সে কথা। যেখানেই লাগুক চড়তো মেরেছিলো। মানুষ মারছে তেনাদের একজনের গালে চড়, কম কথা! তখুনি আর একটি কথা ভেবে বুকটা কাটা মুরগির মতো ধরফর করে উঠলো খয়রার। তেনার গালে যে চড় মারতে পারে কী পেল্লায় ক্ষমতা তার। খয়রা তো গরু, রেগে গিয়ে মহারাজ যদি এখুনি তার গা থেকে চাদরের মতো হেচকা টানে খুলে নেয় চামড়াখানা, তার পর মাথার ওপর বনবন করে ঘোরাতে থাকে, কী করবে খয়রা? ছিলা মুরগীর মতো ছিল। গরু হয়ে কেমন করে ঘুমঘুমির মাঠে চড়ে বেড়াবে! গরু সমাজে মুখ দেখাবে কেমন করে। চতুর বাছুরগুলো যখন দূর থেকে ছিলা গরু ছিলা গরু বলে টিটকিরি দেবে, তখন? খয়রা আর দিকপাশ ভাবলো না। ছিলা গরু হওয়ার চে তেনার সামনে পড়া অনেক ভালো। যায় যাবে প্রাণ তবু তো বাঁচবে মান!
খয়রার দেখাদেখি অন্যরাও নদীতে নামলো। ওপার থেকে এই দৃশ্য দেখে লালটুর মুখে ফুটে ওঠলো ডিঙিনৌকোর মতো একখানা হাসি।

নদীর ধারে, ঘুমঘুমির মাঠ যেখানে শুরু হয়েছে ঠিক সেখানে ঝাকড় মাকড় একখানা বাবলা ঝোপ। কদিন ধরে এই ঝোপে বাসা বাঁধছে এক দুর্গা টুনটুনি। খুবই মনোযোগ দিয়ে বাসাটা সে বাঁধছে। পেটে তিনখানা ডিম। বাসা বাঁধা শেষ হলে মজা করে ডিম পারতে বসবে। তারপর ডিমে তা দিয়ে কুসি কুসি তিনটি বাচ্চা ফোটাবে, এই আনন্দে বিভোর হয়ে আছে সে। কোনোদিকে তাকায় না। ফুরুৎ করে উড়ে নদীতীরের দুর্বাঘাসে গিয়ে নামে। একটা দুটো মরা দূর্বা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় বাসায় তারপর ঠোঁট দিয়ে সুঁচের মতো করে মরা দুর্বা সেলাই

করে দেয় বাসায়। তারপর আবার উড়ে আসে দূর্বাঘাসের বনে।
ভেঁয়ো পিঁপড়ের সাইজ ধরে এই বনে ঢুকেছিলো রমাকান্ত। ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেছে। বেশ ছায়া ছায়া, বেশ শীতল জায়গাটি। ঢুকতেই কেমন ঘুম পাচ্ছিলো। সারারাত ঘুমঘুমির মাঠে খেলা করে কেটেছে, সকালবেলা গেছে নানা রকমের ঝক্কি ঝামেলা, ঘুমোতে তো পারেনি রমাকান্ত। এ রকম আরামের জায়গায় কী একটু গড়িয়ে নেবে! ঘুমে এমন করে চোখ টানছে যেনো গলায় দড়ি লাগিয়ে গরু টানছে কোনো রাখাল। মানুষের কোলাকোলির ভঙ্গিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলো দুটো তাগড়া সাইজের দূর্বা। সেই দুর্বালতায় শুয়ে নিমিষে ঘুমে একেবারে দলাই মলাই হয়ে গেলো রমাকান্ত। পৃথিবী আছে না কেয়ামত হয়ে যাচ্ছে কিছুই গোচরে রইলো না তার। দুর্গা টুনটুনিটি মরা দূর্বার আশায় এসে নামলো তার একেবারে বুকের কাছে। রমাকান্তর দেহখানা মরা দূর্বার টুকরো মনে করে ঠোঁটের ডগায় তুলে মুহূর্তে উড়ে গেলো বাবলা ঝোঁপে। রমাকান্ত টেরই পেলো না।

এপারে এসে এমন করে দৌড় দিলো খয়রারা, লালটু একেবারে বেকুব হয়ে গেলো। বেশ তো নদী পেরিয়ে এলো, তারপর এমন দৌড়ের হেতু কী? কী হচ্ছে কী এসব? গরুগুলো কী পাগল হয়ে গেছে?
লালটুও দৌড়তে লাগলো খয়রাদের পিছু পিছু। চিৎকার করে বললো, ওরে খয়রা রে কী হইছে রে বাহে! এমন করছিস ক্যানে!
খয়রারা তখন ঘুমঘুমির মাঠে উঠে গেছে। ছুটতে ছুটতে বললো, সে কথা মুখ ফুটে বলতি পারবো না মহারাজ। তেনাদের কথা মুখে আনতি নেই। আপনি আসুন বাহে। ওখান হতে আসুন, বাদে বলছি।
খয়রার ভাষা শুনে আকাশ থেকে পড়বে কী লালটু আকাশে উঠে গেলো। এই প্রকারের ভাষা কোথায় শিখলো খয়রা। এ্যাঁ!
ঘুমঘুমির মাঠের বেশ খানিকটা ভেতর দিকে এসে থামলো গরুগুলো। লালটু ছুটতে ছুটতে এলো তাদের কাছে। খয়রা হাপাতে হাপাতে বললো, বেয়াদপি নেবেন না মহারাজ। আপনার কথা অমান্যি করেছি। কী করবো, তেনাদের সামনে তো আমরা যেতে পারি না। আমরা যে গরু!
অমান্যি, তেনা এসব কথা শুনে লালটু খুব বিরক্ত হলো। খয়রা কোনো ভুল

করলে লালটুর স্বভাব হচ্ছে তা শুধরে দেয়া। এখনো দিলো। তবে মেজাজ খারাপ করে। বললো, এসব কী কথা খয়রা! অমান্যি নয় অমান্য, তেনা নয় তিনি। এসব কথা কোথায় শিখলি তুই?
এই প্রথম খয়রার মুখে কেলানো একখানা হাসি ফুটে উঠলো। আপনার কাছেই শিখেছি মহারাজ। তরাসে থাকলে নানা রকমের কথা বলেন আপনি। আমি হচ্ছি গিয়ে আপনার ছাত্র। আপনি যা বলেন তাই শিখি।
তরাসে কথাটার মানে বুঝলো না লালটু। বুঝতেও চাইলো না। খিদেয় পেটের ভেতরটা খলবল খলবল করছে। যেনো পেটের গামলায় অনেকগুলো শিং মাছ জিইয়ে রাখা হয়েছে, থেকে থেকে জানান দিচ্ছে তারা। লালটুর খিদের ব্যাপারটা যেনো খয়রারাও টের পেলো। বললো, গুর মুড়ির পোটলা নিন মহারাজ। প্রাতরাশটা সেরে ফেলুন। আমরা চড়তে যাচ্ছি। তবে এদিক পানে থাকবো না কিন্তু, মধ্যমাঠে চলে যাবো। তেনাকে দেখলুম ঘাসবনে ঢুকতে, কখন আবার এদিকে এসে উদয় হবেন!
খয়রা যে গেলুম টেলুম বলছে খেয়ালই করলো না লালটু। গুড় মুড়ির পোটলা খুলে খেতে বসলো।
মাঠের অন্যান্য রাখালরা ততোক্ষণে এসে গেছে। যার যার গরু চড়াতে দিয়ে আজার হয়ে লালটুর কাছে এলো। এখন দিনটা কাটাবে কী খেলা খেলে তার ফিকির করবে।
বন্ধুদের দেখেই দুনম্বর লালটুটির কথা মনে পড়লো লালটুর। সবিস্তারে ঘটনাটা তাদের বললো, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলো না। লালটুর মুখের ওপর হাসাহাসি শুরু করলো।
কী এতো বড়ো অপমান! লালটুকে অবিশ্বাস! এক্ষুণি দুনম্বর লালটুকে ডেকে আনবে সে। বন্ধুদের কাছে প্রমাণ করবে সে একা দুজন হয়ে গেছে।
সদলবলে নদীতীরের দিকে রওনা দিলো লালটু। মাত্র বাবলা ঝোপটার কাছাকাছি এসেছে ঠিক তখুনি।

ঘুমঘোরে রমাকান্ত একসময় টের পেলো দেহখানা তার সুঁচের পেছনে সুতো যেমন করে গাঁথে তেমন গেঁথে কাঁথা সেলাই করার মতো করে কোথায় যেনো

সেলাই করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা চটকে গেলো তার, মেজাজটা খচে গেলো। পেল্লায় একখানা হাই তুলে ওঠে বসলো সে। ভূতেদের নিয়ম হচ্ছে যে রূপ ধরে ঘুমোবে ঘুম ভাঙার পর সে রূপ আর থাকবে না। আপনা আপনি চলে যাবে। বেরিয়ে পড়বে আসল চেহারা। রমাকান্তরও তাই হলো। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আসল রমাকান্ত হয়ে গেলো সে। দূর্গা টুনটুনিটি তখন অপলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এতোটা অবাক টুনটুনি জীবনে সে কখনো হয়নি। আস্ত একখানা ভূতকে সুতো মনে করে সেলাই করে দিচ্ছিলো নিজের বাসায়! টুনটুনি জন্মে এমন কাণ্ড কী কখনো ঘটে।

হঠাৎ করে সম্বিত ফিরে পেলো টুনটনিটি। তারপর 'বাবারে গেছিরে গেছিরে' বলে আকাশ পাথালে উড়াল দিলো। ভয়ে পেটের ভেতরকার ডিম তিনখানা সেদ্ধ হয়ে গেলো তার।

দৃশ্যটি দেখে ভারি একটা আমোদ পেলো রমাকান্ত। খিখি খিখি করে খানিক হাসলো। তারপর লালটুর রূপ ধরে বাবলা ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এলো। লালটুদের মুখোমুখি পড়ে গেলো।

দুনম্বর লালটুকে দেখেই আনন্দে গদগদ হয়ে কিছু একটা বলতে যাবে লালটু তার আগেই সঙ্গে বন্ধুরা 'ভূত ভূত' বলে চিৎকার করে ওঠলো। দিকপাশ ভাবলো না, যে যেদিকে পারে ছুট দিলো কেবল লালটু দাঁড়িয়ে রইলো।

লালটুর মুখের দিকে তাকিয়ে রমাকান্ত তখন খানিক আগে টুনটুনিটির উড়াল দেয়া দেখে যেমন করে হাসছিলো তেমন করে হাসছে। খিখি খিখি।

এই খিখি হাসিটা লালটু একদম সহ্য করতে পারে না। ভালো মেজাজ বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যায়। এখনো হলো। তবে আগের মতো অতোটা নয়। গরুগুলো নদী পার হয়ে মাঠে চলে এসেছে। কিন্তু ধারে কাছে নেই তারা। দেবদারু তলার দিকে চলে গেছে। বাড়ি ফেরার আগে আর এদিক মুখো হবে না। সকালবেলায় নাস্তাটাও লালটু সেরে ফেলেছে। গামছায় গুড় মুড়ি যা বাঁধা ছিলো তার কানাকড়িও শেষ করতে পারেনি। বাকিটা পড়ে আছে। দুপুরে খাবে।

কিন্তু কথা হলো বন্ধুরা লালটুর কথা বিশ্বাস করছিলো না কেন, দুনম্বর লালটুকে দেখে ভূত ভূত বলে ত্রাহি ডাক ছেড়ে পালালোই বা কেন! লালটুর মতো দেখতে আরেকজন লালটু ভূত হয় কী করে! এক রকম চেহারার দুজন মানুষ কী হতে পারে না! যমজ ভাইরা যেমন হয়!

এসব ভেবে লালটুর মাথাটা ঘুড্ডির গোত্তা খাওয়ার মতো তিন চারটা গোত্তা

খেলো। মাথা গোত্তা খেলে ভালো মানুষও খ্যাকশেয়ালের মতো হয়ে যায়। কথা বলে খ্যাক খ্যাক করে। লালটুও খ্যাক খ্যাক করে উঠলো। বকরির মতো হাসছো কেন?

বকরি শব্দটা জীবনেও শোনেনি রমাকান্ত। জিনিসটি ভালো কী খারাপ বুঝতে পারলো না। একবার ভাবলো লালটু বুঝি তার হাসির প্রশংসা করছে। ভেবে হাসিটা আরো জোরদার করতে চাইলো। তারপরই ভাবলো না বুঝে অমন হাসা ঠিক হবে না। বকরি জিনিসটা যদি খারাপ হয়!

মুখটা তিন আঙুল পরিমাণ হা করে লালটুর মুখের দিকে তাকালো রমাকান্ত। বকরি কী?

কথা বলার সময় হা করা মুখটা দুবার মাত্র বন্ধ হলো তার। তারপর যেইকে সেই। ওই তিন আঙুল হা। এটা রমাকান্তর স্বভাব। কোনো কথার মানে বুঝতে না পারলে হা করে থাকে।

কিন্তু এখন একটা বিপত্তি হলো ঘুমঘুমির মাঠের কোণাকানছিতে শক্ত মাটির দুচারটে ঢিবি আছে। কোনো কোনো ঢিবিতে বউবাচ্চা নিয়ে সংসার পেতেছে উইপোকা, কোনো কোনোটায় ইঁদুর কিংবা বেজি। একটা আছে মাঠ বোলতাদের দখলে। বেজায় হার্মাদ পোকা। ধারে কাছে কাউকে ভিড়তে দেয় না। ঢিবির কাছে গিয়ে কেউ তেড়িবেড়ি করেছে তো, কে রে রে রে রে বলে ঝাঁকর দিয়ে বেরুবে। তারপর চারদিক থেকে এমন এট্যাক দেবে, তুমি যেই হও বাছা, উল্লুক ভাল্লুক কী বেল্লুক, না বেল্লুক নয় বেল্লিক, বেল্লুক বলে কোনো কথা নেই, মুখ ফসকে এসে গেছে। ওই যে এক লোক একবার এক দৌড়ে সাংহাই চলে গিয়েছিলো শুনে আরেক লোক চোখ কপালে নয়, মাথার তালুতে তুলে বললো সাংহাই কী সাংহাতিক। আসলে হবে, সাংহাই। কী সাংঘাতিক। বেল্লুকটাও তেমন।

যাকগে, তো মাঠ বোলতাগুলো এমনিতে বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভাঁটিয়ালি কিংবা ভাওয়াইয়া গাইতে গাইতে খুবই নিরীহ ভঙ্গিতে উড়ে বেড়ায়। যেনো জগৎ সংসারের কিছুই তারা বোঝে না।

বাবলা ঝোঁপের ধারে কাছে মাঠ বোলতাদের একজন আজ সকাল থেকেই চড়ছিলো। এই বোলতাটা একটু উজবুক টাইপের আর একটু দিনকানা। ঢিবির মতো কোনো কিছু দেখলেই আর যদি সেই ঢিবিতে থাকে যেমন তেমন কোনো একখানা গর্ত তাহলে সোনায় একেবারে সোহাগা হয়ে যায় সে। নিজের বাড়ি

মনে করে পাঁই করে ঢুকে পড়ে। রমাকান্তকে সে ভেবেছিলো তাদের ঢিবিখানা। তিন আঙুল হা করা মুখটা ভেবেছিলো বাড়ি ঢোকার দরজাখানা। ফলে পাঁই করে ঢুকে গেলো। এমন স্পিডে ঢুকলো, সোজা গিয়ে ধাক্কা খেলো রমাকান্তর টাকরার কাছে একবারে আলজিভে। বকরি কথাটা নিয়ে এমনিতেই টাসকা লেগে আছে রমাকান্তর, তার ওপর এই বিপত্তি, 'উরে রে, উরে রে' বলে এমন একখানা ডাক ছাড়লো রমাকান্ত, লালটু একেবারে বেকুব হয়ে গেলো। ভাবলো রমাকান্তকে বুঝি সাপে কেটেছে। ঘুমঘুমির মাঠে বিস্তর সাপ। ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে রমাকান্তকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো সে। তার আগেই ওয়াক থুঃ করে মুখ থেকে একদলা থুতু ফেললো রমাকান্ত। থুতুর সঙ্গে বোলতাটা একেবারে আছেড়ে পড়লো মাটিতে। ব্যাপারটা কী হয়েছে ততোক্ষণে বুঝে ফেলেছে মাঠ বোলতাটা এবং যাতা রকমের ভয় পেয়েছে। ফলে এক মুহূর্ত আর দেরি করলো না সে। এমন বেদিশা ভঙ্গিতে উড়াল দিলো, ঘুমঘুমির মাঠের দিকে না গিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলো।

কান্ডটা ততোক্ষণে লালটুও বুঝে ফেলেছে। বুঝে এমন হাসি পেলো তার। হিহি হিহি করে হাসতে লাগলো সে।

রমাকান্ত কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, হাসছো কেন?

তোমার মুখে বোলতা ঢুকেছিলো?

বোলতা কী?

লালটুর একটা গল্প মনে পড়লো। এক হিন্দুস্থানীকে এক বাঙালি জিজ্ঞেস করেছে, হিন্দি মে বোলতাকো বোলতা বোলতা নাহি তো কিয়া বোলতা? রমাকান্তও যেনো তেমন করে জিজ্ঞেস করছে। লালটুর হাসি আরো বেড়ে গেলো।

রমাকান্ত বললো, হাসছো যে বড়ো। বলো না। আচ্ছা বোলতাটা না বললে বকরিটা বলো।

লালটু হাসতে হাসতে বললো, বকরি মানে হচ্ছে ছাগল। ছাগল দুই প্রকার। রাম ছাগল আর খোকাছাগল। রামছাগলটা বড়ো, খোকাটা ছোট। তুমি হচ্ছে খোকাছাগল।

ছাগল জিনিসটা খারাপ কী! লালটু তাকে ছাগল বলছে এ তো গৌরবের কথা। রমাকান্ত খুশি হলো, খুব খুশি হলো। কেলানো একখানা হাসি দিয়ে বললো, তুমি যখন বলেছো তবে আমি তাই।

লালটুর হাসি থেমে গেলো। সে ভাবলো দুনম্বর জিনিসটি হদ্য বোকা। বোকার

সঙ্গে মশকরা করতে নেই। এই বোকাটিকে দেখে বন্ধুরা 'ভূত ভূত' রবে ছুটে পালালো! আশ্চর্য কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা মনে পড়লো তার। দুনম্বর লালটুকে সে নিজে চোখে দেখলো ডেঁয়ো পিঁপড়ের সমান হয়ে দুর্বাঘাসের বনে ঢুকে যেতে কিন্তু বেরুলো বাবলা ঝোঁপ থেকে, তবে লালটুর চেহারায়। ব্যাপারটা কী! একবার ছোট হচ্ছে, একবার বড়ো হচ্ছে। জাদুকর নাকি! নাকি সবই লালটুর চোখের ভুল। সবই ভুল দেখছে সে! খয়রাদের নিয়ে তারাসে থাকায় চোখে হয়তো ধন্দ লেগেছে। যাহোক এসব ব্যাপার খোলসা হওয়া ভালো। দুনম্বর লালটুকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

লালটু গম্ভীর গলায় বললো, আমি যা যা জিজ্ঞেস করবো ঠিক ঠিক জবাব দেবে। একটুও মিথ্যে বলবে না।

রমাকান্ত মুখ বেজার করে বললো, মিথ্যে কবো ক্যান। ভূতেরা কী মিথ্যে কহে। মিথ্যে কহে মানুষে। যখন মানুষ ছিলাম তখন দুচারখানা মিথ্যে কহেছি। মটকুরা গাছটির সনে গলায় দড়ি দিয়ে লটকে গেনু, তারবাদে হনু ভূত, মিথ্যে কবো ক্যানে?

এ কী ভাষা! আরে! এতোক্ষণ দিব্যি ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলছিলো হঠাৎ এমন বদলালো কেন? এও তো দেখি খয়রার মতোই। খয়রা বললো সে নাকি আবার লালটুর ছাত্র, তার মানে এ ব্যাটা বেশ দূর দিয়ে লালটুকে অপমান করছে। ধুৎতেরি! তোমার সঙ্গে আর থাকবোই না।

লালটু হন করে হাঁটতে লাগলো। পেছন থেকে রমাকান্ত কাতর গলায় বললো, গিয়ো না ভাইটি। ডাঁড়াও। আমার বড্ড খিদে নেগছে। কিছু খাদ্যি হবে? আমি পথ হারিয়েছি। রেতের আগে ফিরতি পাইরবো না।

গিয়ো না হচ্ছে যেয়ো না, ডাঁড়াও হচ্ছে দাঁড়াও। এরকম বিটকেলে ভাষা শুনে লালটুর আরো রেগে যাবার কথা। কিন্তু রাগলো না সে। 'বড্ড খিদে নেগেছে' কথাটা তার খুব মনে লাগলো। আহা বেচারা না খেয়ে আছে আর তার গামছায় বাঁধা অতোগুলো গুড়মুড়ি! সব ভুলে লালটু বললো, এসো আমার সঙ্গে।

তারপর রমাকান্তর হাত ধরলো। ধরে মুহূর্তেই ছেড়ে দিলো। যেনো বরফের টুকরো মুঠো করে ধরেছিলো।

রমাকান্ত বললো, মেজাজ করিও না ভাইটি। ভূতের হাত তো, ঠানডাই হবে। এতোক্ষণ ধরে নিজেকে ভূত বলছে একজন, লালটুর বন্ধুরাও তাকে দেখে ভূত বলে পালালো, আসল ব্যাপারটা কী! জানতে হয় তো।

লালটু বললো, তুমি যে ভূত বুঝবো কেমন করে?
ওই যে ছোট হয়ে ঘাসবনে ঢুকনু। বাবলা ঝোঁপ থেকে বেরুনু।
এতেই হয়ে গেলো?
না আরও হবিনে। আগে খাদ্যি দাও। বল পাই তার বাদে ফল।
কিন্তু তোমার ভাষা এমন বদলে গেছে কেন?
খিদেয়।
ততোক্ষণে মাঠের যেখানে বসে গুড়মুড়ি খাচ্ছিলো লালটু, যেখানে বন্ধুরা এসে জড়ো হয়েছিলো সেই জায়গাটায় এসে গেছে তারা। লালটু উদাস হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। বন্ধুরা এবং গরুগুলো ধারে কাছে নেই। সবাই চলে গেছে দেবদারু তলায়। ইস এই রোদে এতোদূর এখন হেঁটে যেতে হবে লালটুকে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আনমনা হয়ে গেলো সে।
রমাকান্ত তখন গুড়মুড়ির পোটলা খুলে বসেছে। এমন উপাদেয় খাবার দেখে কোনোদিকে আর তাকালো না সে। গুড়মুড়ির স্তূপে মুখ ঠেকিয়ে সুরুৎ করে এমন একখানা টান দিলো, যেনো প্লেট ভর্তি ডাল ভাত থেকে ভাতটা ছেকে খেয়ে ডালে চুমুক দিয়েছে কেউ। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হলো ওই এক টানে মুড়িগুলো তো আছেই গুড়ের ডেলাগুলোও সোজা পেটে চলে গেলো রমাকান্তর। পেট পুরো ভরলো না, সামান্য ভরলো। তবে ভারি একটা আরাম পেলো সে।
রমাকান্তর সুরুৎ টানটা কানে এসেছিলো লালটুর। আনমনা ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়েছে সে। তারপর কাণ্ডটা দেখে চোখ দুটো ছানাবড়া নয় ডালবড়া হয়ে গেছে। এতোগুলো গুড়মুড়ি এভাবে খেয়ে ফেললো! রাক্ষস নাকি?
খালি গামছাটা হাওয়ার ওপর ঝাপড় মেরে রমাকান্ত খুবই আদুর গলায় বললো, ছি, ছি কী যে বলো! রাক্ষস হবো কেন? আমি হচ্ছি গিয়ে ভূত।
ধুত্তেরি। বার বার এক কথা।
এখন আবার রাগছো কেন? কী সমস্যা?
রাগবো না! সবাই আমাকে ফেলে ওই যে দেখো দেবদারু তলায় চলে গেছে। এতোদূর আমি এখন যাই কী করে? আর রোদখানা কী উঠেছে দেখো। এই রোদে হাঁটা যায়!
রমাকান্ত ফিক করে একটুখানি হাসলো। ওরা তো আমাকে দেখে পালিয়েছে। গরু এবং রাখাল দোহে মিলে চিনেছে। কেবল তোমাকেই চেনাতে পারলুম না। চোখ বোঁজো। তোমাকে দেওদারু তলায় পৌছে দিই। আমিও সঙ্গে যাচ্ছি, তবে

আমি থাকবো দেওদারুর মগ ডালে। হাওয়ায় মিশে থাকবো। কেউ দেখতি পাবে না।
কিছু না বুঝেই চোখ বুঁজলো লালটু। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা থাবা এসে পড়লো তার ঘাড়ে আর একটি পড়লো একত্রে দুপায়ে। একেবারে ছোট্ট শিশুকে ঘাড় এবং দুপায়ে ধরে আদর করে যেমন দোলায় মা বাবা, লালটুকে তেমন করে দুতিনটি দোলানী দিলো সেই থাবা তারপর মাঠ পাথালে ছুঁড়ে মারলো।
চোখ মেলে ভারি অবাক হলো লালটু। কোথায় মাঠপার, সে তো বসে আছে দেবদারু তলায়। কী করে হলো কাণ্ডটা! তাজ্জব ব্যাপার!
সঙ্গে সঙ্গে রমাকান্তর কথা মনে পড়লো লালটুর। একসময় পালপাড়ার কলাবাগানে তীর ধনুকের খেলা খেলতে যেতো লালটুরা। বাঁশের কঞ্চি এবং চিকন শক্ত দড়ি দিয়ে নিজেরাই তৈরি করে নিতো খেলনা তীর ধনুক। কলাবাগানে ঢুকে দূর থেকে একেকটি কলাগাছ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তো একেকজন। খচাং করে তীর গিয়ে বিঁধতো কলাগাছে। লালটুর ব্যাপারটা অনেকটা তেমন। রমাকান্তর কথা মতো চোখ বুঁজেছিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতো তাকে ফিট করা হলো ধনুকে। তারপ সাঁ করে ছুঁড়ে মারলো বিশাল একটি হাত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেবদারু তলার মাটিতে এসে গেঁথে গেলো লালটু। দেবদারু তলার মাটি বেজায় শক্ত। আশ্চর্য ব্যাপার, লালটু কিন্তু তা টেরই পেলো না। মনে হলো নরম একখানা খড়ের গাদায় এসে ঝপ করে বসে পড়েছে সে।
রাখাল বন্ধুরা তখন গোল হয়ে বসে আছে দেবদারু তলায়। আজ আর খেলাধুলা করছে না তারা। দুষ্টুমিও করছে না। কী রকম চিন্তিত। ইতিউতি অলস ভঙ্গিতে চড়ে বেড়াচ্ছে গরুগুলো।
পুবপাড়ার ঝগড়ুটে রাখাল হুজ্জত। নাম যেমন স্বভাবও তেমন হুজ্জতের। কথায় কথায় হুজ্জতি করে। বুড়ো মতন একটা গরু আছে তার, ধবলি। বয়স হয়েছে বলে চলাফেরা কম করে। সকালবেলা গোয়াল থেকে সে আর বেরুতেই চায় না। বসে থাকে তো বসেই থাকে। হুজ্জত তাকে লেজে মোচড় দিয়ে দাঁড় করায়, তারপর লেজ মোচড়াতে মোচড়াতে ঘুমঘুমির মাঠ অব্দি নিয়ে আসে। মাঠে আসার পর ধবলিকে নিয়ে হুজ্জতের আর তেমন কোনো মাথাব্যথা থাকে না। হুজ্জত বুন্ধদের সঙ্গে হুজ্জতিতে ব্যস্ত হয় আর ধবলি পেটের দায়ে খানিক ঘাস খায়,

খানিক দেবদারুর ছায়ায় এসে বসে থাকে। অলসভাবে বসে থাকা গরুরা সাধারণত জাবর কাটে। কিন্তু ধবলি জাবরটাও কাটে না। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি গরুটার। জাবর কাটতেও ক্লান্ত লাগে তার। বসে বসে শুধু ঝিমোয়। বাড়ি ফেরার সময় হুজ্জত এসে লেজ মোচড় দিলে তবে দাঁড়ায়, তবে চলাচল করে। লেজের কাছে মহা সুড়সুড়ি ধবলির, মোচড় দিলে কাতুকুতু লাগে। সেই ভয়ে চলে। কাতকুতুটা না থাকলে ধবলিকে নিয়ে যে কী করতো হুজ্জত!

সেই ধবলি এখন বসে আছে অদূরে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ভিড়ের গাড়িতে চলাফেরা করা ঘুমকাতুরে মানুষ যেমন ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পাশের যাত্রীর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে তারপর লজ্জা পেয়ে ঘুমের চটক ভেঙে জেগে ওঠে, তারপর আবার ঢুলতে থাকে, ধবলির অবস্থা ঠিক তেমন। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে মুখটা তার মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে মুখ তুলছে সে। তারপর আবার যেই কে সেই।

অন্যদিন হলে ধবলিকে নিয়ে মজা করতো হুজ্জতরা। লেজ মোচড় দিতো, কানে ঢুকিয়ে দিতো লম্বা কাঠি। কিছুতেই ঢুলতে দিতো না। আজ কিন্তু ধবলির দিকে মনোযোগই নেই তাদের। সকালবেলা দেখা হতেই লালটু বললো সে একা দুজন হয়ে গেছে। হুজ্জতরা কেউ বিশ্বাস করেনি। লালটু তাদের ডেকে নিয়ে গেছে নদীতীরে। তীর অব্দি যেতে হয়নি, মাঠপারের বাবলা ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এলো আরেকজন লালটু। একজন মানুষের পক্ষে তো দুজন হওয়া সম্ভব নয়। আর লালটুর কোনো যমজ ভাইও নেই। তাহলে দুনম্বর লালটুটি নিশ্চয় ভূত। ওরা তারপর ভূত ভূত বলে ছুটে পালিয়েছে। লালটুর দিকে ফিরেও তাকায়নি। সোজা চলে এসেছে দেবদারুতলায়। ভয়ে বুক ঢিবঢিব করছে সবার। কেউ কাউকে ছেড়ে এক পা নড়েনি। ভয়ে একা যাতে কেউ কাবু না হয় এজন্যে জোট বেঁধে আছে। দুপুর হয়ে এলো তবু খিদে লাগছে না কারো।

হুজ্জত চিন্তিত গলায় বললো, নাহ এই মাঠে আর গরু চড়াতে আসবো না।

গদাই নামের রাখালটি বেশ গাবদা গোবদা। তার হাতপাগুলো মানকচুর মতো, পেটখানা যেনো ঝোলা গুড়ের মটকা। মাথাটা ছোট, হুবহু একখানা কতবেল। সে বললো, কেন?

এই মাঠে ভূত আছে।

গদাই খুব চিন্তিত হয়ে গেলো। ওটা কী সত্যি ভূত?

তো! মানুষ কী একা দুজন হয়! হলেই বা বাবলা ঝোঁপ থেকে বেরুবে কেমন

করে! বাবলা কাঁটায় গা চিরিবিরি হয়ে যাবে না! ওটার তো দেখি কিছুই হয়নি। কেমন খিখি করে হাসছিলো। গায়ে কাঁটা লাগলে কেউ অমন করে হাসে!

নাবালক মিয়া নামের রাখালটি তোতলা। কথা বলবার সময় চোখ দুখানা খুব পাকায় সে। চোখের মণি ঢুকে যায় ভেতরে, বেরিয়ে পড়ে শাদা ডিম। অদ্ভুত লাগে দেখতে। এখনো তেমন চোখ করে তোতলাতে তোতলাতে বললো, ভূ ভূ ভূতের ক কথা ব ব বলিস না। আ আ আ আমার ড ডর ক ক করে।

আরেকজন রাখালের নাম ছিছকা। সে ভারি ছিছকাঁদুনে। ভালো কী মন্দ সব কথাতেই কাঁদে। এতোক্ষণ বন্ধুদের কথা শুনছিলো সে। হঠাৎ ফুফ ফুস করে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, লালটু গেলো কোথায়? একা পেয়ে ভূতে যদি লালটুকে খেয়ে ফেলে! ঙো ঙো ঙো।

হুজ্জত চিন্তিত গলায় বললো, তাইতো!

এ কথায় নাবালক একটু রেগে গেলো। ভূ ভূত কী বা বা বাঘ নাকি যে খে খে খে খেয়ে ফেলবে।

ছিছকা তবু কান্না থামালো না। ঙো ঙো করে কাঁদতেই লাগলো।

এবার কথা বললো গদাই। আমি শুনেছি ভূতেরা নাকি মরা মানুষের ঘিলু ছাড়া আর কিছু খায় না। মানুষ মরে গেলে মরা মানুষের মাথাটা নারকেলের মতো ভেঙে, আমরা যেমন নারকেল খাই তেমন করে ঘিলুটা খায়। এজন্যে ভূতগুলো নাকি খুব বোকা হয়।

হুজ্জত বললো, যাহা মানুষ তাহলে ভূতকে ভয় পায় কেন?

ছিছকা কাঁদতে কাঁদতে বললো, তোরা শুধু ঝগড়াই করছিস। লালটুর কথা কেউ ভাবছিস না। ঙো ঙো। ভূতটা যদি লালটকে নিয়ে ভেগে যায়, ঙো ঙো, আমরা তাহলে লালটু পাবো কোথায়! ঙো ঙো ঙো।

ছিছকার এরকম আকুল করা কান্না দেখে সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলো। একেকজন একেক ভাষায় সান্ত্বনা দিতে লাগলো তাকে। ঠিক তখনি লালটু এসে বসলো তাদের একেবারে মাঝেখানে। উড়ে এসেছে ঠিকই তবে এমন নিঃশব্দে, কেউ কিছু টেরই পেলো না।

লালটু বললো, কিরে ছিছকা কাঁদছিস কেন?

লালটুর কথা শুনে বাজপড়ার মতো চমকে উঠলো সবাই। একসঙ্গে তাকালো লালটুর দিকে। এমন অবাক হলো, কারো মুখে কোনো কথা জুটলো না। ছিছকার কান্নাটা মিনিট খানেকের জন্য থেমে গেলো। তারপর গেলো বেড়ে। এবার ভেউ

ভেউ করে কাঁদতে লাগলো সে। কাঁদতে কাঁদতে বললো, তুই কোথায় ছিলি? ভেউ ভেউ। কেমন করে এলি? ভেউ। ভূতটা তোকে ছেড়ে দিলো? ভেউ ভেউ ভেউ।

ছিছকার কথা এবং অন্যরকম কান্না শুনে নড়েচড়ে উঠলো সবাই। চমক ভেঙে গেলো। চোখে পলক পড়লো।

হুজ্জত বললো, তুই ছিলি কোথায়? কেমন করে এলি?

গদাই বললো, আমরা যে তোকে দেখলাম না?

নাবালক বললো, তু তু তুই কী মা মা মানুষ না ভূ ভূত?

ছিছকা কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি তোকে, ভেউ ভেউ, একটু ধরে দেখি। ভূত হলে তোর গা হবে মাছের মতন ঠাণ্ডা। ভেউ ভেউ।

লালটু বুঝে গেলো এখন কিছু চালাকি করতে হবে। কাণ্ড যা ঘটেছে তার একটিও বলা যাবে না। তাহলে কেচ্ছা কেলেংকারি হয়ে যাবে। রমাকান্তর কথা একদম চেপে যেতে হবে।

লালটু হাসি মুখে বললো, আমি তো তোদের সঙ্গে সঙ্গেই এলাম।

হুজ্জত বললো, যাহ!

হ্যাঁ তবে লুকিয়ে লুকিয়ে। তোরা যাতে দেখতে না পাস।

গদাই বললো, এ রকম খোলা মাঠে কেমন করে লুকালি তুই? এখানে লুকোবার জায়গা কোথায়?

আমি অনেক রকমের কায়দা জানি। দেখলি না একা কেমন দুজন হয়ে গেলাম। একজন গিয়া লুকালাম বাবলা ঝোঁপে, আরেকজন তোদের সঙ্গে।

এটুকু বলেই লালটু বুঝে গেলো প্যাঁচঘোচ লেগে যাচ্ছে। এতো মিথ্যে সামাল দিতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে কথা বদলালো সে। মুখের হাসিটা আরো লম্বা করে বললো, এসবের কিছুই কিন্তু আসলে ঘটেনি জানিস। মানুষ একা দুজন হয় কী করে? কথাটি তোদের বলে আগে ভাগেই আমি বাবলা ঝোঁপে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। চালাকি করেছি। তোদের ভয় দেখালাম। খেলা, এটা একটা খেলা।

লালটুর কথা শুনে নাবালক মিয়া বেশ বড়ো করে একটা হাঁপ ছাড়লো। তা তাই ব ব বল।

ছিছকার কান্নাটাও থামলো।

হুজ্জত তার চোখ দুখানা পিতিপিতি করে তাকিয়ে আছে লালটুর দিকে। চোখ

দেখে বোঝা যায় লালটুর কথা বিশ্বাস করেনি সে। লালটুকে সন্দেহ করছে।

তবে গদাই এসবের কোনো কিছুর মধ্যেই নেই। তার বেজায় খিদে পেয়েছে। দুতিন দিনের অনাহারি মানুষের মতো খোনা গলায় সে বললো, আমার খিদে পেয়েছে, আমি এখন খাবো। খিদে পেলে তোরাও খা।

তারপর সে তার খাবারের পোটলা খুললো।

গদাইয়ের দেখাদেখি অন্যরাও খুললো। দেখতে দেখতে গোল হয়ে বসা রাখালদের মাঝখানকার জায়গাটি খাবারে প্রায় ভরে গেলো। কেউ এনেছে গুড় মুড়ি, কেউ চিড়ে মিছরি, কেউ খই বাতাসা। ছিছকা এনেছে এককাদি মর্তমান কলা।

এসব দেখে লালটু বেশ একটা বিপাকে পড়ে গেলো। তার খাবার তো সব রমাকান্ত সাবড়ে দিয়েছে। এখন?

হুজ্জত বললো, তোর খাবার কইরে লালটু?

ঠিক তখনি লালটুর কানের কাছে ফিস ফিস করে উঠলো কে। আমি এসে গেছি। লালটু বুঝতে পারলো না কথাটা কে বলেছে। অবাক গলায় বললো, এ্যাঁ?

ফিসফিসে কণ্ঠটি চাপা একটা ধমক দিলো তাকে। আহ্ এতো জোরে কথা বলছো কেন? আমি এসেছি, রমাকান্ত। তোমাকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে দৌড়ে এনু তোমার পেছু পেছু। এখন বড়ো হাঁপ নাগছে।

এনু পেছু নাগছে এসব কথা শুনে লালটু বুঝে গেলো এ সত্যি সত্যি রমাকান্ত। কিন্তু রমাকান্তকে কেউ দেখছে না তো! রমাকান্তের কথা কেউ শুনছে নাতো! বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো লালটু।

না, কেউ কিছু শুনতে পায়নি। কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। সে এ্যাঁ বলেছে শুনে বন্ধুরা ভেবেছে হুজ্জতের কথায় এ্যাঁ করেছে সে।

রমাকান্ত বললো, আমি তোমার পাশে আছি। তবে হাওয়ায় মিশে আছি। কেউ দেখতি পাবি না। আমার কথাও কেউ শুনতি পাবি না। কেবল তুমি শুনতি পাবি।

ভারি আমুদে গলায় খিখি করে একটু হাসলো রমাকান্ত। তারপর বললো, খাবারের কথাটা মিথ্যে করে বলো। বলো ভুল করি পোটলাটা মাঠপারে থুয়ে এসেছো।

কথাটা রমাকান্তর মতো করেই বললো লালটু। শুনে হুজ্জত বললো, অসুবিধা কী! তুই আমাদের সঙ্গে খা। ম্যালা খাবার আছে।

এতোসব খাবার দেখে রমাকান্তর আবার খিদে পেয়ে গেলো। খিদের চোটে তার মনেই রইলো না কথা সে ফিসফিস করে বলছে। স্বাভাবিক মানুষের মতো শব্দ করে বললো, আমিও খাবো।

বন্ধুরা সব চমকে উঠলো।

হুজ্জত বললো, কে, কেরে?

হাওয়ায় মিশে থাকা রমাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটলো। লালটুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসে গলায় বললো, ভুল হয়ে গেছে। আর করবো না। তুমি সামাল দেও বাহে।

সঙ্গে সঙ্গে লালটু বললো, কেউ না। আমিই।

গদাই বললো, তোর গলা অমন শোনালো কেন?

আমার খুব সর্দি লেগেছে।

হুজ্জত আবার চোখ পিতিপিতি করে তাকালো লালটুর দিকে।

রমাকান্ত বললো, তোমরা খেতে নাগো মহারাজ। আমি গরুটাকে তাড়িয়ে আসি। এখন থাকলে সে আমায় চিনে ফেলবে। হাম্বা রবে রাখালদের তেরোটা বাজাবে।

সঙ্গে সঙ্গে লালটু তাকালো ধবলির দিকে। অদূরে দেবদারুর ছায়ায় বসে ঘুমে ঢুলছে। মুখটা গিয়ে ঠেকেছে মাটিতে। এ অবস্থায় যেনো কানের ভেতর পাটখড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ এমন করে চমকে উঠলো ধবলি। তারপর বিকট একখানা হাম্বা দিয়ে ছাগলছানার মতো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো। রাখালরা সব খাওয়া ভুলে অবাক হয়ে ধবলির দিকে তাকালো। তারপর জীবনে যা দেখেনি তাই দেখলো। রেসের ঘোড়ার মতো তীরবেগে ঘুমঘুমির মাঠ ভেঙে ছুটে যাচ্ছে ধবলি।

মজাদার দৃশ্য দেখে লোকে যেমন দেয় হাততালি মোটকা গদাই ঠিক তেমনি করে দেয় পেটতালি। অতিকায় পেটখানা আকুলি বিকুলি করে চাপড়াতে থাকে, দিকপাশ তাকিয়ে দেখে না। ভরা থাকলে পেটতালি দেয়ার সময় দূর থেকে রেলগাড়ি আসার মতো গুমগম শব্দ হয় আর খালি থাকলে শব্দটা হয় অবিকল তবলার বোলের মতো, তেরে কেটে তুম, তেরে কেটে তুম। শুনে বোঝা যায়, পেটতালিটা গদাই বেশ ভালো রকম মকশো করেছে। তাল জ্ঞান অসাধারণ, একেবারে আল্লারাখা খাঁর মতন। একটুও কাটে না।

ভরা পেটে নয় খালি পেটে তালিটা জমে ভালো। প্রথমে তেরে কেটে তুম তারপর সামান্য ফাঁক দিয়ে ধিন তানা নানা নানা ধিন। গদাইর পেটতালি শুনে রাখাল বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় পেটতালিটা গদাইর একদমই আসে না। বন্ধুরা নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। এমন কী গদাই নিজেও নিজের পেটের ওপর হাত চালিয়ে দেখেছে, হয় না। মজাদার দৃশ্যের সময় নিজে গদাই টেরই পায় না কখন হাত দুটা চলে যায় পেটে, কখন কেমন করে বাজতে থাকে!

ধবলির অমন করে ছুটে যাওয়া দেখে আজ অনেককাল পর পেটতালি দিতে লাগলো গদাই। বন্ধুরা ধবলির ছুটে যাওয়া দেখবে কী সব ভুলে গদাইর দিকে তাকিয়ে রইলো। ধবলির ছুটে যাওয়ার চে' এ দৃশ্য অধিক মনোরম, সঙ্গে শব্দও আছে। আর আজকের শব্দটিও অন্যরকম। ঢোল ডগর নয় পেটতালির শব্দটা হচ্ছে কাসরের মতো। কাঁইনানা কাঁইনানা।

বন্ধুরা দেখছে গদাইকে আর গদাই দেখছে ধবলিকে। নিজের অজান্তে পেটতালিটা দিচ্ছে ঠিকই তবে চোখ দুটো তার ধবলির দিকে।

ছুটতে ছুটতে ধবলি তখন অন্য গরুগুলোর মাঝমধ্যিখানে গিয়ে পড়েছে। ছুট খানিক থামিয়ে গরুভাষায় ভাই বন্ধুদের কী কী বললো সে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গরুগুলোও ছুট লাগালো, এমন কী লালটুর খয়রাটাও। দেখতে দেখতে বন চড়ুইর মতো ছোট হলো তারা, তারপর মাঠপারে মিলিয়ে গেলো।

মজাদার দৃশ্যটি চোখের সামনে নেই দেখে পেটতালিটা আপনা আপনি থেমে গেলো গদাইয়ের।

লালটুদের মতো রমাকান্তও মুগ্ধ হয়ে গদাইয়ের পেটতালি শুনছিলো। শব্দটা থামতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। সেদ্ধ গোলালুর মতো গদগদ গলায় বললো, ভারি মনোহর বাজনা বটে।

বলেই বুঝে গেলো ধুন্দুমার কাণ্ড হয়ে যাবে। আগের বার লালটু না হয় সামাল দিয়েছে, এবার! চোখে কাউকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে বাঁজখাই গলার কথাবার্তা, ব্যাপারটা কী!

হাওয়ায় মিশে থাকা রমাকান্ত চিন্তিত হয়ে গেলো। না এমন আর করা যাবে না। নিজেকে সামলে সুমলে রাখতে হবে। কথা বলার জন্য জিভের ডগা পিরপির করলেও কথা বলা যাবে না।

তবে বাঁচোয়া হলো রমাকান্তর কথা কেউ খেয়াল করেনি। এমন কী লালটুও।

সবাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। পেটতালি থেমে গেছে তবে গদাই তখন খিটখিট, খিটখিট করে হাসছে। হাসতে হাসতে বললো, যাহ্ সবগুলো ভাগলভা! ততোক্ষণে গদাইর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে বন্ধুরা, তাকিয়েছে মাঠের দিকে। কিন্তু কোথাও কোনো গরু নেই। পাঁচ রাখালের পঞ্চাশ ষাটখানা গরু নিমিষে উধাও হয়ে গেছে।

বমি করার মতো হর হর শব্দে হুজ্জত বললো, কারবারটা কী! লেজ মুচড়েও যে ধবলিকে এক পা নড়ানো যায়না সে কিনা অমন করে ছুটলো! সঙ্গে গেলো অন্যগুলো। গরুদের কী মাথা খারাপ হয়েছে!

নাবালক মিয়া চোখের মণি উল্টে, শাদা ডিম বের করে বললো, না না মা মা মাথা নয় পে পে পেট খা খারাপ হ হ হয়েছে। পে পে পেটে কা কামড় হ হয়েছে। পে পে পেটে কা কা কামড় খে খেয়ে অ অ অমন ক করে ছু ছু ছু ছুটছে কথাটা ঠোঁটে একেবারে আটকে গেলো নাবালকের, কিছুতেই ছাড়া পায় না। ফলে হা করে রইলো সে। ভঙ্গিটা এমন যেন চুরি করে আস্তো একখানা গরম জিলিপি মুখে দিয়ে ফেলেছে এখন গিলতে পারছে না উগড়াতেও পারছে না। নাবালকের এই ধরনের বেকায়দায় বন্ধুরা তাকে সাহায্য করে, কথা বলে ঠোঁট থেকে কথাটা ছাড়িয়ে দেয়। এখন সেই কাজটা করলো লালটু। বললো, ছুটছে।

সঙ্গে সঙ্গে হা বন্ধ হলো নাবালকের। ঢোক গেলার মতো করে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ ছু ছুটছে।

গরুদের পেটে কামড় (বাংলাদেশের কোনো কোনো গ্রামে আমাশাকে বলে পেটে কামড়। নাবালক মিয়া তেমন এক গ্রামের ছেলে) হয়েছে শুনে ছিছকা আবার কাঁদতে লাগলো। এবার তার কান্নার শব্দটা অবিকল ছাগলের মতো। অ্যাঁ বলিস কী! ম্যা ম্যা, পেটে কামড় হয়েছে! ম্যা ম্যা ম্যা। কী হবে এখন? ম্যা ম্যা।

হুজ্জত বললো, কী আর হবে ননীতীরে ম্যালা গোবর জমবে। ঘুটে কুড়োনীদের পোয়া তেরো।

পোয়া তেরো নয় কথাটা হচ্ছে পোয়া বারো, রমাকান্ত জানে। তার মা সিপরু কথায় কথায় পোয়া বারো কথাটা বলে। সুতরাং হুজ্জতের ভুলটা একদম সহ্য হলো না তার। খানিক আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলো কিছুতেই শব্দ করে কথা বলবে না, কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো সেই প্রতিজ্ঞা! পাঠশালার পণ্ডিতদের মতো গলা উঁচিয়ে বললো, পোয়া তেরো নহে পোয়া বারো।

গায়ে বিছুটি লাগলে যেমন করে লাফিয়ে ওঠে লোকে, রমাকান্তর গলা শুনে ঠিক

তেমন করে লাফিয়ে উঠলো হুজ্জত। কে, কেরে? কে কথা বলে?

রমাকান্তর ওপর বেজায় রেগে গেলো লালটু। ইচ্ছে হলো হাওয়ায় মিশে থাকা রমাকান্তর গালে ঠাস করে একটা চড় মারে। কিন্তু সে উপায় নেই, রমাকান্ত যে আছে কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া বন্ধুরাই বা বলবে কী! 'তুমি চুপ করো' বলে যে ধমক দেবে তাও তো সম্ভব নয়, বন্ধুরা জেনে যাবে। এ তো মহা মুসিবত!

লালটুর কানের কাছে মুখ এনে কাচুমাচু গলায় রমাকান্ত বললো, সামাল দাও বাছে। এই শেষ, এই কান মলছি এমন আর হবি না নে।

ব্যাঙের মতো ঘ্যাংঘর ঘ্যাং করে বার দুয়েক গলা খাঁকাড়ি দিল লালটু। তারপর অবিকল রমাকান্তর গলায় বললো, কেউ না আমি।

বাইন মাছের মতো পাঁই করে একটা মোচড় খেলো হুজ্জত। না তুই না। অন্য কেউ।

ছিছকা ম্যা ম্যা কান্নাটা কাঁদছেই। কাঁদতে কাঁদতে বললো, কী সব হচ্ছে আজ? ম্যা ম্যা, কে কথা বলে না বলে বুঝতেই পারিছ না। ম্যা ম্যা মা।

নাবালক তার তোতলা ভাষায় ছিছকাকে একটা ধমক দিলো। ছু ছুই থা থা থাম। ম্যা ম্যা করিস না।

বন্ধুরা যে এতো কথাটথা বলেছে গদাই এসবের কিছুই খেয়াল করেনি। সে তাকিয়েছিলো মাঠের দিকে। হঠাৎ বন্ধুদের দিকে মুখ ফেরালো সে। কী হয়েছে রে?

হুজ্জত বললো, মাঝে মাঝে কে যেনো কথা বলে। আমি দুবার শুনেছি। সর্দি লাগা খোনা গলা।

মুখটা লম্বা করে কেলানো একটা হাসি হাসলো গদাই। ও তোর মনের ভুল। লালটু কথা বলেছে। আর কে বলবে। এখানে কী ভূত আছে?

ভূত কথাটা শুনে ভারি আমোদ লাগলো রমাকান্তর। চেপে চেপে হাসতে চাইলো সে কিন্তু দাঁতের ফাঁক দিয়ে খিক করে একটু শব্দ বেরিয়ে গেলো। এবার হুজ্জত এবং ছিছকা এক সঙ্গে লাফ দিলো। কে, কে হাসলো?

হাসির শব্দটা নাবালকও শুনেছে তবে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। খানিক টাসকা লেগে থাকলো সে। তারপর কী একটা কথা বলতে গেলো পারলো না, কথাটা দুই ঠোঁটের মাঝখানে আটকে গেলো। বন্ধুরা কেউ নাবালককে সাহায্য করলো না, ফলে ঠোঁটের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে রইলো সে।

গদাই বললো, কোথায় কার হাসি শুনছিস তোরা? আমি তো কিছু শুনছি না। ভারি খিদে পেয়েছে আমার। আয় খেতে বোস।

ধপাস করে বসে পড়লো গদাই। হুমহাম করে গুড় মুড়ি খেতে লাগলো। অন্যদের দিকে তাকিয়ে লালটু বললো, এসব বাজে চিন্তা বাদ দে। খেতে বোস।

নাবালক এবং ছিছকা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো। হুজ্জতকে হাত ধরে বসালো লালটু। তোর সব তাতে বেশি বেশি। আমরা ছাড়া কে আছে এখানে? কে কথা বলবে, কে হাসবে!

হুজ্জত তবু নিশ্চিত হলো না। এক খাবলা চিড়ে মুখে পুড়ে চিন্তিত গলায় বললো, আমি শুনলাম যে!

ভুল শুনেছিস।

আমার কখনো ভুল হয় না।

তুই কী ভূত নাকি যে তোর ভুল হবে না?

সঙ্গে সঙ্গে কোকসার কাছে রমাকান্তর কনুইয়ের একটা গুতো খেলো লালটু। কানের কাছে ফিসফিসে গলায় শুনতে পেলো, মিথ্যে কথা কহো ক্যানে? আমার যে বারংবার ভুল হচ্ছি দেখতি পাচ্ছো না! ছোট হলি কী হবি আমি কী ভূত নহি?

লালটু বিড়বিড় করে বললো, একদম চুপ, কথা বলো না।

লালটুর বিড়বিড়ানোটা দেখতে পেলো হুজ্জত। খাওয়া থামিয়ে বললো, কী বলছিস রে?

কিছু না। নিজে নিজে একটু বিড়বিড় করলাম। আমার আজ ভারি মজা লাগছে। কখনো শব্দ করে অন্য রকম গলায় কথা বলছি, কখনো বিড়বিড় করছি।

গদাই বললো, কিন্তু খাচ্ছিস না কেন?

কারটা খাবো?

ছিছকার কান্না অনেকক্ষণ হলো থেমেছে। সে বললো, যার পোটলা থেকে ইচ্ছে খা।

নাবালক বললো, তা তার চে এ এ এক কা কাজ ক কর। স সবার খা খা খাবার এ এক স স সঙ্গে ক কর।

আরো কিছু বলতে চাইলো নাবালক তার আগেই লালটু বললো, হ্যাঁ সবার খাবার এক সঙ্গে কর, সবাই এক জায়গা থেকে খাই। সব শেষে খাবো কলা।

সঙ্গে সঙ্গে চিড়ে মুড়ি খই গুড় মিছরি বাতাসা এক সঙ্গে মেশালো গদাই। পাঁচটা হাত এক সঙ্গে এসে পড়লো সেই খাবারের ওপর, যে যার মতো করে খেতে

লাগলো। এতো খাবার পাঁচজনে খেয়ে শেষ করার কথা নয় কিন্তু তিন চার মুঠ করেও খাওয়া হয়নি কারো, খাবার শেষ। কান্ডটা কী! এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

গদাই বললো, কী রে শেষ করে ফেললি? আমার পেটের তো এক কোণাও ভরেনি।

হুজ্জত বললো, আমারও তো।

ছিছকা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, হ্যাঁ তো। আমারও তো ভরেনি তো!

নাবালকের আজ ঘনঘন কথা আটকাচ্ছে। এখনো আটকালে। সে কিছু বলতে পারলে না। মুখটা ছুচোর মুখের মতো করে বসে রইলো।

লালটু তো যা বোঝার বুঝেই গেছে। হাত তো খাবারে পাঁচটা পড়েনি। পড়েছে ছয়টা। ছয় নম্বরটা রমাকান্তর। তার একমুঠো অন্যের দশ মুঠোর সমান।

এই ব্যাপারটাও সামাল দিলো লালটু। বললো, খাবার তো আজ কম হবেই। আমি খেলাম না? আয় কলা খাই পেট ভরে যাবে। কলা যা আছে একেক জনের দুতিনটে করে হয়ে যাবে।

কলার দিকে মাত্র হাত বাড়াতে যাবে সবাই, দেখে আপনা আপনি কাদি থেকে ছিঁড়ে যাচ্ছে একটি কলা এবং শূন্যে উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে বসে থাকা লালটুদের মাথার ওপর উঠে গেলো কলাটি। তারপর আপনা আপনি খোসা অর্ধেক মতো খুললো এবং লোকে যেমন করে খায় তেমন করে যেনো এক কামড়ে কলার অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো কেউ। এই দৃশ্য দেখে কোলা ব্যাঙের মতো অতিকায় একটা লাফ দিলো হুজ্জত তারপর 'বাবারে গেছিরে গেছিরে' ত্রাহি চিৎকার এবং ছুট। হুজ্জতের দেখাদেখি ছিচকা এবং নাবালকও ছুট দিলো। বসে রইলো কেবল লালটু আর গদাই। তবে একটি কলা আপনা আপনি অমন কান্ড করছে দেখে এবং হুজ্জতরাও গরুর মতো ছুটে যাচ্ছে দেখে বেজায় খুশি হলো গদাই। মনের আনন্দে পেটতালি দিতে লাগলো সে।

দেবদারুতলার ঘাসগুলো একেবারে ছানার মতো। খাওয়া দাওয়ার পর সেই ঘাসে শুয়ে ঘুমটা গদাই দেবেই। শুয়েই পড়ার পর চোখ বোঁজারও সময় পায় না, ঘুম এসে যায়। এজন্যে তাকিয়ে তাকিয়েই ঘুমাতে হয় গদাইকে।

গদাইয়ের আর একটি স্বভাব সে কখনো কাত হয়ে শুতে পারে না, উপুর হয়ে শুতে পারে না। শোয় চিৎ হয়ে। হাত পা যতোদূর ছড়ানো সম্ভব ছড়িয়ে, অতিকায় ভুঁড়িটি আকাশের দিকে উঁচিয়ে, মুখখানা হা করে ঘুমে একেবারে গোবর হয়ে যায়। সর্দিটা গদাইর লেগেই থাকে, ফলে নাকের ফুটো দুটো থাকে বন্ধ। শ্বাস টানতে হয় মুখ দিয়ে। তবে শ্বাস টানায় শব্দ খুব একটা হয় না। হয়, সামান্য। যখন টানে শব্দটা হয় লুউউস করে, ছাড়ার সময় হয় ফুউউস। এবং এতো দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা চালিয়ে যায় সে মনেই হয় না এ কোনো মানুষের কাজ। ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গদাইর কাছে কোত্থেকে যেনো রোজই উড়ে আসে এক টুকরো কাঁশ কিংবা শিমূল তুলোর রেণু। এসে ঠিক গদাইয়ের হা করা মুখের সামনে দাঁড়ায়। গদাই শ্বাস টানলে রেণুটা সুরুৎ করে মুখের ভেতর চলে যায়, প্রশ্বাসে বেরিয়ে আসে। তবে একেবারেই চলে যেতে পারে না। যাবে কী করে, ফাঁক পেলে তো! গদাই কী আর শ্বাস ফেলে সময় নেয়, নেয় না, সঙ্গে সঙ্গেই টানে। ফলে যতোক্ষণ সে ঘুমোয় রেণুটা একবার মুখের ভেতর যায়, একবার বেরিয়ে আসে। যেনো এই তার দায়িত্ব। আগে কোনো কোনো দুপুরে একাকী দেবদারু তলায় ঘুমোতে চলে আসতো গদাই। লালটুরা আশেপাশেই থাকতো, কাছে আসতো না। নির্জন গাছতলায় ওভাবে পড়ে আছে একটি মানুষ, হাত পা ছড়ানো, ভুঁড়িটি ভাসানো, চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকানো, এ কেমন করে জ্যান্ত মানুষ হয়, ঘুমন্ত মানুষ হয়! দেখে যে কেউ ভাববে একটি লাশ পড়ে আছে। নিশ্চয় জলে ডুবে মরেছে। জল খেয়ে পেটটা গেছে ডাউস হয়ে। মরে গেছে ঠিকই কিন্তু চোখ বোঁজার সময়টা পায়নি। ঘুমঘুমির মাঠের বাসিন্দা এক খ্যাকশেয়ালের কয়েকদিন ধরে আহার জুটছিলো না। শেয়াল খাদ্যের ভারি অভাব লেগেছে দেশে। গ্রামে গিয়ে যে হাঁস মুরগি ধরে আনবে, উপায় নেই। নেড়িকুত্তাগুলো এমন একা কাট্টা হয়ে আছে শেয়াল তো দূরের কথা শেয়ালের ছায়া দেখলেই রে রে রে করে তেড়ে আসে। গ্রামমুখো হওয়ার উপায় নেই। নদীতে নেমে যে থাবা দিয়ে মাছ ধরবে, মাছগুলো গেছে বেজায় চতুর হয়ে। জলের ওপর শেয়ালের ছায়া দেখলে কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়! আগে প্রায়ই গরু ছাগলের মড়ক লাগতো গ্রামে। মরা গরু ছাগলের মড়ক লাগলে মুচি এবং শেয়াল শকুনের মচ্ছব লেগে যায়। মুচিরা চামড়া খুলে নেয়, শেয়াল শকুনে মাংসটা খায়, মুড়ির মতো কুরমুর করে হাড়টা খায়। গরু ছাগল আজকাল মরছেই না। শেয়ালের সর্বশেষ খাদ্য মরা মানুষ। অন্য কিছু না জুটলে গোরস্থানে

চলে যায় তারা। সামনের দুটো পা কোদালের মতো চালিয়ে নতুন কবরগুলো ফুটো করে তারপর কবরে নেমে মানুষের ধরটা খায়, মুরোটা খায়! কী যে হয়েছে দেশে, মানুষও আজকাল মরছে না! শেয়ালেরা খায় কী!

পেট ভর্তি খিদে নিয়ে এই শেয়ালটা সেদিন মটকা মেরে নিজের গর্তে পড়েছিলো। হঠাৎই গর্তের মুখে ভোমা সাইজের একটি মাছি দেখা গেলো। ভোঁ ভোঁ করে গান গাইছে সে আর উড়ছে। শেয়াল চোখ তুলে মাছিটির দিকে তাকালো। গরু ছাগল মরলে এই মাছিরা এসে খবর দেয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো শেয়াল। সংবাদ কী, দূত?

বেশ কয়েকদিনের অনাহারী বলে শব্দটা ঠিক মতো গলা দিয়ে বেরুলো না। তবু শুনতে পেলো মাছি। শেয়ালের মুখের কাছে দুটো পটকন খেয়ে বললো, মরেছে, মরেছে। তারপর কোথায় উধাও হয়ে গেলো।

আর কথা কী! লাফ দিয়ে গর্ত থেকে বেরুলো শেয়াল। খুব বেশি দূর যেতে হলো না, দেবদারুতলায়ই লাশটা দেখতে পেলো। দেখে চোখ তালবড়া হয়ে গেলো তার। একি কাণ্ড! গোরস্থান থেকে উঠে লাশটা কেন এখানে চলে এসেছে! আজকাল কী লাশরাও হাঁটাচলা করছে নাকি! যা ইচ্ছে করুক গে আমি আমার ভুঁড়ি ভোজটা সেরে নিই।

এই শেয়ালটির রুচিটুচি খুবই ভালো। মানুষ খেলে প্রথমে মানুষের খিলুটা খায় সে। খিলু খেয়ে মুখ মিষ্টি করে তারপর হাত পা খায়, ঘাড় গলা খায়। সেদিনও তাই করলো। দিকপাশ না তাকিয়ে গাঁক করে লাশটির মাথা কামড়ে ধরলো। গদাই তো ঘুমে একেবারে গোবর! আচমকা মাথায় ওরকম একটা কামড় খেয়ে কিছু না বুঝে ভয়াবহ একটা চিৎকার দিলো সে, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। কামড় খাওয়া জায়গাটা দুহাতে চেপে ধরে মাগো বাবাগো, ফুফাগো চাচীগো বলে এমন ডাক ছাড়তে লাগলো, দেবদারুর ডালে বসা কাকগুলো পর্যন্ত ভড়কে গিয়ে কা কা রবে আকাশে উড়াল দিলো।

শেয়ালটা কিন্তু ভড়কায়নি। সে যারপরনাই অবাক হয়েছে। জীবনে এতো কিছু দেখেছে, মরা মানুষ কখনো জ্যান্ত হতে দেখেনি। লাশকে কখনো উঠে দাঁড়াতে দেখেনি, এভাবে তড়পাতড়পি করতে দেখেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে গদাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

ব্যাপারটা কী হয়েছে গদাই ততোক্ষণে বুঝে গেছে। সামনেই পড়েছিলো গরু চরাবার লাঠি, ছোঁ মেরে সেটা তুললো সে তারপর তেড়ে গেলো শেয়ালটির

দিকে। এতো বড়ো সাহস, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস। ভেবেছিস আমি মরে গেছি! এ্যাঁ!

প্রথমে পাঁই করে একটা লাফ দিলো শেয়াল, তারপর এমন একখানা দৌড় দিলো, অনাহারী শরীরে কোথেকে যে অমন দৌড় দেয়ার শক্তি এলো তার, কে জানে!

কিন্তু তারপর থেকে দেবদারুতলায় একা কখনো শোয় না গদাই। খাওয়া দাওয়া সেরে হুজ্জতরা চারপাশে বসে হুজ্জতি করে আর গদাই চিৎ হয়ে ঘুমোয়। চোখ দুটো খোলা, মুখটা হা করা যেনো এইমাত্র জলে ডুবে মরেছে।

আজ শুতে শুতে বেশ দেরি হয়ে গেলো গদাইয়ের। সকাল থেকে ম্যালা ঝক্কি ঝামেলা গেছে। একা লালটু হয়ে গিয়েছিলো দুজন, মাঝে মাঝে কে যেনো কথা বলে, চেহারা দেখা যায় না তার। ধবলি কী কাণ্ডটা করলো! সবচে আশ্চর্য ব্যাপার আপনা আপনি একটি কলা উঠে গেলো শূন্যে, মুখ দেখা গেলো না তবু কে যেনো এক কামড়ে অর্ধেকটা কলা খেয়ে ফেললো। হুজ্জত ছিছকারা দিলো দৌড়। বোধহয় গরু নিয়ে এতোক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। দেবদারুতলায় এখন গদাই আর লালটু ছাড়া কেউ নেই। লালটুটা কী রকম চিন্তিত হয়ে আছে!

এক পলক লালটুকে দেখে শুয়ে পড়লো গদাই। তবে শুয়ে কিন্তু ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলো লালটুর দিকে। লালটু জানে অমন করে তাকিয়ে থাকলে কী হবে গদাই কিছুই দেখছে না, ঘুমিয়ে গেছে।

ঠিক তখুনি লালটুর কানের কাছে মুখ এনে খুবই চিন্তিত গলায় রমাকান্ত বললো, ও লাটলু, লাটলু, দগাই কী মরে গেছে?

লালটু খেঁকুড়ে গলায় বললো, লাটলু না আমার নাম লালটু। আর ওর নামও দগাই না, গদাই।

লাশ দেখলি আমার সব ভুল হয়ি যায়।

লালটু গম্ভীর গলায় বললো, মরেনি। ঘুমোচ্ছে।

টেকিয়ে টেকিয়ে?

টেকিয়ে টেকিয়ে না তাকিয়ে তাকিয়ে। গদাই এভাবেই ঘুমোয়।

টাই বলো। টোমরা মানুষরা ভূতের চেয়িও বিচিত্রি। একটি কথা কবো লাটলু?

এবার আর ভুলটা ধরলো না লালটু। বললো, বলো

গদাই যখন নিদোচ্ছে এই ফাঁকে আমি তাহার পোটটি একটু বাজাই।

লালটু বুঝলো নিদোচ্ছে মানে নিদ যাচ্ছে, ঘুম যাচ্ছে। শব্দটা ভালোই লাগলো তার। তবে বেশি ভালো লাগলো রমাকান্তর ইচ্ছেটা জেনে। গদাই ঘুমোচ্ছে এই ফাঁকে তার পেটটি তবলার মতো করে বাজাতে চাইছে সে। গদাই টেরও পাবে

না কিন্তু তার পেটটি বাজতে থাকবে। ভারি মজা হবে।

লালটু বললো, বাজাও।

সঙ্গে সঙ্গে গদাইর পেটের সামনে প্রথমে কুয়াশার মতো তারপর একদম স্পষ্ট আরেকজন লালটু ফুটে উঠলো। আসনপিরি করে বসে আছে দুনম্বর লালটু। এক ফাঁকে আসল লালটুর দিকে তাকালো সে। তারপর কেলানো একটা হাসি হেসে দুহাতে ঠিক তবলার কায়দায় গদাইর পেট বাজাতে লাগলো। দেখতে দেখতে জমে গেলো বাজনাটা। লালটু মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো কখন বিকেল ফুরিয়ে এলো টের পেলো না।

ঘুমের ভেতর গদাই টের পেলো তার পেটটা ভারি মনোহর তালে বাজছে। এতো সুন্দর করে সে নিজেও বাজাতে পারে না। কে বাজায়?

ঘুম ভেঙে গেলো গদাইয়ের। চোখ খুলেই যেহেতু ঘুমোয় চোখ আর খুলবার দরকার হলো না। এমন কী নড়লোও না সে, দেখতে পেলো তার পেটের কাছে বসে আপন মনে ঝুম হয়ে তার পেট বাজিয়ে যাচ্ছে লালটু আর অদূরে বসে মুগ্ধ হয়ে সেই বাজনা শুনছে আরেকজন লালটু।

একি কাণ্ড! গদাই কী স্বপ্ন দেখছে!

পট পট করে চোখে কয়েকটা পলক ফেললো গদাই। এরকম পলক ফেলার পর স্বপ্ন আর থাকতে পারে না। কিন্তু দৃশ্যটা বদলালো না। তাহলে সকাল থেকে যা ঘটছে সব সত্য!

এই প্রথম ভয়ে আতঙ্কে গদাই একেবারে মাটির ডেলা হয়ে গেলো। নড়াচড়ার শক্তি রইলো না তার। শ্বাস ফেলার শক্তি রইলো না। যেমন তাকিয়ে ছিলো তাকিয়ে রইলো।

দেবদারুর মগডাল থেকে ঠিক তখুনি নেমে এলো বিশাল একটি হাত। এসে অদূরে বসে থাকা লালটুর ঘাড়টা ধরলো। ধরে খুব আদুরে ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে শূন্যে তুলতে লাগলো। খোশামুদে মোটা গলায় বললো, বাবা রমাকান্ত, রাগ করেছিস? রাগ করে বাড়ি ফিরিসনি? তোর মা খুব কান্নাকাটি করছে। আমি তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি বাপ। আমি মরাকাটি। তোর বাবা।

গদাইর পেট বাজানো বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো রমাকান্ত। আরে করো কী করো কী, ও না তো। এই যে আমি। তুমি কেমন ভূত, তোমারও ভুল হয়।

ছেলের কথায় খুবই লজ্জা পেলো মরাকাটি। জিভ কেটে আলতো করে লালটুকে

নামিয়ে দিলো মাটিতে রমাকান্ত গিয়ে লালটুর সামনে দাঁড়ালো। তুমি রাগ করিও না লাটলু। আমার বাবা ভুল করে তোমাকে

রমাকান্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই হাপুর জুপুর করে উঠলো গদাই। তারপর ভূত ভূত বলে চৌ চৌ দৌড়। গদাইর দৌড় দেখে খানিক আগের কাণ্ডটির কথা ভুলে গেলো লালটু। কে তাকে অমন করে শূন্যে তুলছিলো ভুলে গেলো।

দেবদারুর মগডাল থেকে মরাকাটি তখন মাটিতে নেমেছে। নেমে রমাকান্তর হাত ধরেছে। সে তো হাওয়ায় মিশে আছে, লালটু তাকে দেখতে পাচ্ছিলো না, রমাকান্ত পাচ্ছিলো। সে আবদেরে গলায় বললো, না আমি যাবো না, আমি লাটলুর সঙ্গে থাকবো।

মরাকাটি বললো, কী করে থাকবি বাপ? ভূত কী মানুষের সঙ্গে থাকতে পারে?

আমি পারবো। লাটলু খুব ভালো ছেলে।

যতো ভালোই হোক মানুষ কখনো ভূত দেখতে পারে না। ভূত পছন্দ করে না।

লালটু অবাক হয়ে বাপ ছেলের কথা শুনছিলো। একজনকে দেখতে পাচ্ছে একজনকে পাচ্ছে না। সন্ধে হয়ে আসছে। ঘুমঘুমির মাঠে সে আর দুটো ভূত, আর কেউ নেই। তবু একটুও ভয় করছে না লালটুর। ভূত দুটোকে তার মানুষের মতোই মনে হচ্ছে।

রমাকান্ত মন খারাপ করা গলায় বললো, লাটলু আমি তাহলে যাই। আবার আসবোনি। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।

তারপর মরাকাটিকে বললো, আমি হাঁটতি পাইরবো না বাবা, আমাকে কাঁধে নাও।

হাওয়ায় মিশে থাকা মরাকাটি গদগদ গলায় বললো, আয় বাপ আয়।

ছোট্ট শিশু যেমন করে বাবার কাঁধে চড়ে ঠিক তেমন করে মরাকাটির কাঁধে চড়লো রমাকান্ত। তখনো লালটু সেজে আছে সে, সুতরাং তাকে দেখা যাচ্ছিলো, মরাকাটিকে দেখা যাচ্ছিলো না। কাঁধে বসে আছে কেউ কিন্তু যার কাঁধে বসে আছে তাকে দেখা যাচ্ছে না, কি কাণ্ড! মনে হচ্ছে হাওয়ার ওপর বসে আছে রমাকান্ত।

তারপরই ঘুমঘুমির মাঠ ভেঙে হাঁটতে লাগলো হাওয়ায় মিশে থাকা মরাকাটি। কাঁধে রমাকান্ত। লালটুর মনে হলো, হাওয়ায় ভেসে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে রমাকান্ত। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। ভূত হলে কী হবে রমাকান্ত খুবই ভালো।

ফিরে এল রমাকান্ত কামার

বিকেলবেলা খয়রার পিঠে চড়ে বাড়ি ফিরছে লালটু, ঘুমঘুমির মাঠ ছড়িয়ে যে নদী, নদীটা মাত্র পার হয়েছে, মাথার পেছন দিকে টিকির চুল ধরে কে একটা টান দিল। বাড়ি ফেরার সময় লালটু বেশ ক্লান্ত থাকে। সারাদিন ঘুমঘুমির মাঠে গরু চড়ানো, বন্ধুদের সঙ্গে ছুটোছুটি, খেলাধুলো, ফেরার সময় হাত পা একেবারে ভেঙে আসে। শরীর অবশ লাগে। ফলে খয়রার পিঠে চড়ে বসার পর ভারী একটা ঘুমঘুম ভাব হয়। এখনও তেমন একটা ভাবের মধ্যে ছিল। টিকিতে টান খেয়ে ধরফড় করে উঠল। কে, কেরে?

আসলে প্রথমে লালটু বুঝতেই পারেনি সে খয়রার পিঠে বসে আছে। ঘুমঘোরে ছিল বলে তার মনে হয়েছে সে আছে ঘুমঘুমির মাঠে। মাঠের দেবদারু গাছটির তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, সেই ফাঁকে বন্ধুরা কেউ তার টিকি ধরে টান দিয়েছে।

কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে বেকুব হয়ে গেল লালটু। কোথায় ঘুমঘুমির মাঠ! সে বসে আছে খয়রার পিঠে। সামনে বাদ্যকার বাড়ির একপাল গরু, গরুদের সর্দার খয়রা তাকে পিঠে নিয়ে পালের পিছু পিছু হাঁটছে। ভোরবেলা মাঠে আসার সময় খয়রা থাকে পালের আগে, ফেরার সময় একদম পেছনে। কারণ তখন সে হাঁটে খুবই আস্তে ধীরে। লালটুর মেজাজমর্জি তার মুখস্থ। ফেরার সময় মহারাজ যে তার পিঠে বসে ঘুমোন খয়রা তা জানে। জোরে চললে ধপাস করে পিঠ থেকে যদি পড়ে যান তাহলে খয়রার আর গতি নেই! কী যে হবে খয়রা তা ভাবতেও পারে না! মহারাজ ওই অতটুক পুচকে হলে কী হবে, তেনারাও তাঁকে যমের মতো ডরান।

পিঠে বসা লালটুর হঠাৎ করে অমন কে, কেরে শুনে খয়রা বেশ ভড়কে গেল। নিজের অজান্তে থেমে গেল সে। কী হয়েছে মহারাজ?

ততক্ষণে নিজেকে সামলে ফেলেছে লালটু। বলল, না, কিছু না।

তাহলে অমন ভড়কে উঠলেন কেন?

এমনি। তুই চল।

খয়রা তবু নড়ল না। বিনীত গলায় বলল, খোয়াব দেখেছেন?
লালটুর মনে হল, ঠিক কথাটাই বলেছে খয়রা। ঘুমঘোরে সে বোধহয় স্বপ্নই দেখেছে। স্বপ্নে কেউ তার টিকি ধরে টান দিয়েছে।
লালটু একটা হাঁপ ছাড়ল। তারপর ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে খেকুড়ে গলায় বলল, হতে পারে। কিন্তু স্বপ্নকে তুই খোয়াব বলিস কেন? ইস, তুই আর মানুষ হলি না, গরুই রয়ে গেলি!
খয়রা বেজায় লজ্জা পেল। লজ্জা পেলে হাঁটাচলা ধীর হয় তার। এখনও হল। এইমাত্র হাঁটতে শেখা শিশুর মতো একপা দুপা করে এগুতে লাগল সে। অন্য গরুরা তখন বহুদূর এগিয়ে গেছে। সোনারঙ গা প্রায় ধরে ফেলল। বিকেলের রোদ তাদের পায়ের ধুলোয় শাদা হয়ে গেছে।
কিন্তু খয়রা হাঁটছে কি হাঁটছে না সেদিক আর খেয়াল রইল না লালটুর, সে আবার ঘুমে ঢুলতে লাগল।
ঠিক তখুনি টিকির কাছে আবার টান। এবার একটু জোরে। লালটু সামান্য ব্যথা পেল। এবার আর কে, কেরে বলল না, ওহ্ করে একটু শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে চলা থামাল খয়রা। ব্যাকুল গলায় বলল, কী হল মহারাজ, আবার খোয়াব দেখলেন? আপনারা মানুষরা এত ঘন ঘন খোয়াব দেখেন কেন? তাও দিনের অন্ধকারে!
একসঙ্গে এতগুলো কথা বলায় শেষদিকে গুলিয়ে ফেলল খয়রা। দিনের আলোকে বলল দিনের অন্ধকার। শুনে টিকির টানের কথা ভুলে গেল লালটু। খেকুড়ে গলায় বলল, আবার ভুল কথা। দিনের অন্ধকার নয় গাধা, দিনের আলো।
লালটুর ধমক খেয়ে লজ্জায় মুখ নোয়াল খয়রা। ভুল হয়ে গেছে মহারাজ!
এত ঘন ঘন ভুল হয় কেন? দিনভর কাড়ি কাড়ি ভাত খেতে তো ভুল হয় না।
ভাত না মহারাজ, ঘাস।
খয়রা তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে দেখে যারপরনাই লজ্জা পেল লালটু। একেবারেই বেকুব হয়ে গেল সে। ব্যাপারটা বুঝল খয়রা। বুঝে বেশ একটা সহানুভূতির গলায় বলল, দিল খারাপ করবেন না মহারাজ। মানুষেরও ভুল হয়।
মনকে দিল বলছে খয়রা। কথাটা কানে লাগল লালটুর। নিজের ভুলের কথা ভুলে আবার খয়রার ভুল ধরতে যাবে লালটু, লালটুর ঘাড়ের কাছে কে একটা শ্বাস ফেলল। শ্বাসটা বরফের মতো শীতল। ফলে গা এমন করে কাঁটা দিল লালটুর, লালটু প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাবে, কানের কাছে মুখ এনে কে ফিসফিস করে

বলল, লালটু, ও লালটু, আমি এইসে পড়েছি।
সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা গলায় লালটু বলতে গেল, কেরে, তার আগেই বরফের মতো শীতল একটি হাত তার মুখ চেপে ধরল। রাঁ করিও না। খয়ের খাঁ বুইঝে যাবে। আমি রমা, রমাকান্ত কামার।
রমাকান্ত ফিরে এসেছে!
মুহূর্তে ঘুমভাব কোথায় হাওয়া হয়ে গেল লালটুর। গরু হয়ে খয়রা তাকে ভুল ধরিয়ে দিয়েছে সেই অপমানের কথা মনেও হল না। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে গেল, অদৃশ্য শীতল একটা হাত কাঁধের কাছটা চেপে ধরল, অমন করিও না ভাইটি, পইড়ে যাবে।
লালটু গদগদ গলায় বলল, তুমি এতকাল কোথায় ছিলে? ঘুমঘুমির মাঠে প্রতিদিন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করি!
লালটুর কথা শুনে থমকে দাঁড়াল খয়রা। ব্যাকুল গলায় বলল, কী হল মহারাজ? আবার খোয়াব, না না ভুল হয়েছে, আবার স্বপ্ন দেখলেন?
লালটু কথা বলবার আগেই তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসে গলায় রমাকান্ত বলল, শব্দ কইরে কথা কহিও না। গরুটি বুইঝে যাবে। বুইঝে গেলে কেচ্ছা কেলেংকারি হবে। প্রাণভয়ে এমন কইরে ছুইটবে, তোমার রফা দফা হবে।
দফা রফাকে উল্টো করে বলল রমাকান্ত। কিন্তু লালটু কিছু মনে করল না। নিজেকে সামলে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় খয়রাকে বলল, আমি একা একা কথা বলছি। তুই তোর মতো চল।
কিন্তু একা একা কথা কওয়া তো ভালো না। দুটি সময়ে মানুষ একা একা কথা বলে। এক পাগল হলে, দুই ভূতে ধরলে। আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মহারাজ?
খয়রার কথা শুনে খিক করে হাসল রমাকান্ত। অনেকটা সাবধান থাকার পরও নিজেকে সামলাতে পারেনি। শব্দ বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করল খয়রা। কে হাসল মহারাজ?
রমাকান্তর হাসির শব্দে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল লালটু। খয়রার কথা শুনে ব্যাপারটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল। কে আবার হাসবে, আমিই।
কিন্তু আওয়াজখান অন্যরকম ঠেকল যে।
তারপর একটু থেমে খয়রা বলল, বেয়াদবি নেবেন না মহারাজ, একখানা প্রশ্ন না করে পারছি না। আপনি আজ খুবই উল্টাপাল্টা করছেন। কে কেরে বলে কাকে

যেন কী জিজ্ঞাসিলেন। একা একা কথা বলছেন, অন্যের মতো গলা করে হাসছেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

না না, পাগল হব কেন?

তাহলে আপনাকে কি ভূতে ধরেছে?

আরে না না তুই হাঁট তো। আমাকে নিয়ে ভাবিস না। আমি আজ একটু আমোদে আছি, এ জন্য এমন করছি।

তারপর ফিসফিসে গলায় রমাকান্তকে লালটু বলল, রমাকান্ত, আছ তো?

লালটুর ডান কানের কাছ থেকে রমাকান্ত বলল, আছি।

কোথায়?

তোমার ডান কানের গর্তের কাছে বইসে আছি।

টের পাচ্ছি না যে!

এবার তোমাকে খুব অন্যরকম লাগছে।

কী রকম?

আগে হাওয়ায় ভেসে থাকলেও গরুরা তোমায় দেখতে পেত। তোমার ভূতগন্ধ নাকে এসে লাগত তাদের। এবার দেখি কিছুই হচ্ছে না। খয়রার এত কাছে আছ তাও খয়রা কিছু বুঝতে পারছে না।

রমাকান্ত কুলকুল করে হাসল। গরুদের চোখ কান ফাঁকি দেয়ার কায়দাখানা আমি শিইখে ফেলেছি। কাছে থাকলেও উহারা আমায় দেইখতে পাবে না।

আনন্দে আটখানা হয়ে লালটু বলল, এটা একটা কাজের কাজ করেছ।

তুমি খুশি হয়েছ লালটু?

খুব খুশি হয়েছি।

তাহলে আমি তোমার কান থেইকে নামি। তোমার পিছনে বইসে তোমার সঙ্গে কথা কহি।

ঠিক আছে।

লালটুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং করে একটা লাফ দিল খয়রা। লালটু প্রায় কাত হয়ে পড়ছিল, অদৃশ্য দুহাতে রমাকান্ত তাকে আঁকড়ে রাখল। কিন্তু মেজাজ সেই ফাঁকে যতটা খারাপ হওয়ার হয়ে গেছে লালটুর। ভয়াবহ তিরিক্ষি গলায় লালটু বলল, কিরে খয়রা, বড় যে তিড়িংবিড়িং করছিস? প্যাদানি খাবি?

খয়রা নিশেহারা গলায় বলল, আমি কী করব মহারাজ! হঠাৎ করে পিঠে মনে হল বরফের চাঁই পড়েছে। অমন ঠাণ্ডা লাগলে লম্ফ না দিয়ে পারি?

এখানে বরফের চাঁই আসবে কোত্থেকে?

তাহা তো আমিও বুঝতে পারছি না।

লালটুর কানের কাছে মুখ এনে রমাকান্ত বলল, চেইপে যাও ভাইটি। ভুলখানা আমারই হয়েছে। এতকাল পর তোমাকে পেয়ে গদগদ হয়ে গেছি। বসতে গিয়ে আসল শরীর ছেড়ে দিয়েছিলাম।

লালটু বলল, তাই বল।

রমাকান্ত কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই খয়রা বলল, মহারাজ, আপনি এমন ওজনদার হয়ে গেলেন কেন? হঠাৎ করে মনে হচ্ছে দুজন আপনি আমার পৃষ্ঠে বসে আছেন।

লালটু বুঝল এও রমাকান্তর ভুল। খয়রা লাফিয়ে ওঠার পর শীতল শরীরখানা সরিয়ে নিয়েছে সে কিন্তু ওজনটা নেয়নি। ফলে একজন লালটুকে দুজন মনে হচ্ছে খয়রার।

কনুই দিয়ে রমাকান্তকে একটা গুঁতো মারল লালটু। তাড়াতাড়ি ঠিক হও। খয়রা কিন্তু বুঝে যাচ্ছে।

রমাকান্ত বলল, এই হনু বাহে।

সঙ্গে সঙ্গে খয়রা বেশ আমুদে গলায় বলল, এই তো আগের মতো মালুম হচ্ছে মহারাজ।

আপনাকে একজনই মনে হচ্ছে।

ততক্ষণে গ্রামসীমায় এসে ঢুকেছে খয়রা। খয়রার পিঠে বসে শেষ বিকেলের মনোরম আলোয় সোনারঙ গ্রামখানিকে সোনার মতো ঝকমক ঝকমক করতে দেখল লালটু। দেখে বলল, রমাকান্ত, তুমি কিন্তু আজ আমার সঙ্গে থাকবে। ফিরে যেতে পারবে না। সারারাত তোমার সঙ্গে আমি গল্প করব।

রমাকান্ত বিগলিত গলায় বলল, শুধু আজ রাত কেন, তুমি বললে সব সময় আমি তোমার সঙ্গে থেকে যাব।

সত্যি?

সত্যি।

তাহলে তাই কর।

গ্রামে ঢোকার মুখে পাহারাদারের ভঙ্গিতে বসে থাকে গ্রামের নেড়িকুত্তাগুলো। এখনও ছিল। খয়রাকে দেখেই এক সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তারা। তারপর তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। লালটু কিংবা খয়রা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভয়ার্ত

গলায় রমাকান্ত বলল, সর্বনাশ! উহারা তো আমায় চিইনে ফেলেছে। গরুর কান ফাঁকি দেয়ার কায়দা শিখেছি, কুত্তাদেরটা তো শিখিনি। এখন উপায় কী বাহে?
রমাকান্তর কথা শুনে লালটু খুবই হতাশ হল। সে যে অবিরাম রমাকান্তের সঙ্গে কথা বলছে, এই নিয়ে খয়রা যে বেশ চিন্তিত, ভাবছে লালটু পাগল হয়ে গেছে নয়ত তাকে ভূতে ধরেছে, সবভুলে কাতর গলায় বলল, তাহলে কী হবে এখন? তুমি গ্রামে ঢুকবে কী করে? গ্রামে না ঢুকলে আমাদের বাড়ি যাবে কী করে, আমার সঙ্গে থাকবে কী করে? রমাকান্ত কথা বলবার আগেই খয়রা তার লটর পটর করা কান দুটো শিংয়ের মতো খাড়া করে ফেলল। লালটু যেখানে বসে আছে তার পেছন দিকে লেজটা করল 'পাচন বাড়ি' মানে গরু চড়াবার লাঠির মতো শক্ত এবং খাড়া। সব মিলিয়ে খয়রার ভঙ্গিটা একে বারেই যুদ্ধংদেহি। মুখে ঘোৎ ঘোৎ একটা আওয়াজ করছে সে।
সামনে গ্রামে ঢোকার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে একপাল নেড়িকুত্তা, মুহূর্ত কাল বিরাম না দিয়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে খেউ খেউ খেউ খেউ করছে তো করছেই। সেই শব্দে দশদিক মুখরিত, কান ঝালাপালা। খয়রা ছাড়া বাকি গরুগুলো আগেই পগাড়পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ বাদ্যকর বাড়ি পৌছে গেছে। বাড়ি ফিরে গরুগুলো নিয়ে টুকুর টাকুর কিছু কাজ থাকে লালটুর। কোনও কোনও গরু সারাদিন পেট পুরে খাওয়া দাওয়া করার ফলে, এতদুর পথ হেঁটে বাড়ি ফেরার ফলে এতটাই কাহিল হয়ে পড়ে, গোয়ালে ঢোকার আর সময় পায় না। বাড়ির উঠোনেই লেছড়ে পেছড়ে বসে পড়ে। বসেই চোখ বুজে জাবর কাটতে থাকে। লেজে কঠিন করে মোচড় না দিলে কারও বাপের সাধ্যি নেই সেগুলোকে দাঁড় করায়।
এই কাজটা আজ কে করবে? নিশ্চয় দুচারটে গরু এতক্ষণে বাড়ির উঠোন দখল করে ফেলেছে। অন্ধকারে গরুগুলোকে দেখতে না পেলে বাড়ির বউঝিরা এ ঘর ও ঘর করার সময় গরু বাছুরের ওপর ওষ্ঠা খেয়ে পড়বে।
একবার যদি কেউ ওষ্ঠা খায় তাহলে আর রক্ষে নেই লালটুর। বউঝিগুলো বাড়ির বেজায় কাহিল। প্রতিবছরই শীতকালে দুচারটি করে পটল তোলে। হলে হবে কী, গরুর ওপর ওষ্ঠা গেলে খুবই অসম্মান বোধ করবে তারা। বাড়ির গরুর মতো জোয়ান পুরুষদের বলে মার খাওয়াবে লালটুকে। আর সে কী যে সে মার! লালটুর কাঠির মতো গর্দানটা ধরে, রমাকান্তর বাবা রমাকান্তকে যেমন করে শূন্যে তুলেছিল ঠিক সে কায়দায় এক হাতে শূন্যে তুলবে লালটুকে। তারপর শূন্যে তুলে রেখেই অন্যহাতে একেক গালে দুখানা করে মোট চারখানা চড় কষাবে।

সেই চড়ে নিঃশব্দে দুমাড়ি থেকে মুখের ভেতর লালটুর খসে পড়বে দুচারটি দাঁত।
এই অব্দি ভেবে বাকি কাণ্ডকারখানা ভাববার কথা ভুলে গেল লালটু।
খয়রার পিঠে, লালটুর পেছনে বসে রমাকান্ত কোন ফাঁকে কুনকুন কুনকুন করে কাঁদতে শুরু করেছে।
একদিকে বাড়ি ফিরে লালটুর মার খাওয়ার ভয়, অন্যদিকে খয়রার যুদ্ধংদেহি ভাব, আরেকদিকে রমাকান্তর কান্না সব মিলে লালটু একেবারে বিদিশে হয়ে গেল। কী রেখে কী করবে বুঝতে পারল না।
ঠিক তখনি খয়রা বলল, জুত করে বইসে থাকবেন মহারাজ। এক চুল নইড়বেন না।
এই প্রথম লালটুর মনে হল খয়রা এবং রমাকান্ত প্রায় একই ভাষায় কথা বলে। এ কী করে সম্ভব? গরু এবং ভূত কি এক জিনিস!
রমাকান্তর কান্নাটা তখন শুনতে পেয়েছে খয়রা। নেড়িদের অমন বাজখাই খেউ খেউ ছাপিয়ে কেমন করে অমন কুনকুনে কান্নাটা শুনতে পেল সে কে জানে, বলল, কে কাঁদিছে মহারাজ? আপনি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। কুত্তাদের ভয়ে আপনার মতো মানুষ কাঁদিছে! ইহা দেখার আগে আমার মরণ হইল না ক্যানে! আপনি কাঁদিবেন না মহারাজ। কুত্তাদের আমি দেখে নেব। বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না এক টুকরো মেদিনী।
খয়রার কথা শুনে এত কিছুর মধ্যেও বেশ একটা আরাম বোধ হল লালটুর। যাক, রমাকান্তর কান্নাটাকে লালটুর কান্না বলে ভুল করেছে খয়রা। ভালোই হয়েছে। নয়ত সামনের নেড়িকুত্তার দল যে তার পিছে বাচ্চা একটি ভূত বসে থাকতে দেখে অমন করছে টের পেলে ভূতের ভয়ে মাগো মাগো বাবাগো বলে ত্রাহি চিৎকারে প্রাণ ফাটাত খয়রা। গায়ে 'বিলার চিমটি' (বিছুটি) লাগলে যেমন করে তড়পায় লোকে তেমন করে তড়পাতে শুরু করত। ফলে মুহূর্তে খয়রার পিঠ থেকে পড়ে যেত লালটু, খয়রার পায়ের তলায় পড়ে প্রাণটি তার যেতেও পারত।
কনুই দিয়ে রমাকান্তকে একটা গুঁতো দিল লালটু। ফিসফিস করে বলল, এই, তুমি থাম তো। কাঁদছ কেন?
তবু কান্না থামাল না রমাকান্ত। কুনকুনে আওয়াজটা একটু কমাল, নাকি গলায় প্রতিটি কথার ওপর চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে বলল, ওঁপায় কী হঁবে? কুঁত্তারা তোঁ পঁথ ছাঁইড়ছে নাঁ।

ছাড়বে। খয়রা ব্যবস্থা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল রমাকান্তর। চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে উৎফুল্ল গলায় বলল, তাই বটে? তোমার খয়ের খাঁ তো খুব ভালো জীব হে!

আনন্দে গদগদ হয়ে গিয়েছিল বলে 'হে' কথাটা বেশ শব্দ করে বলে ফেলেছে রমাকান্ত। খয়রা স্পষ্ট তা শুনতে পেল।

তবে বুঝতে পারল না। বলল, কিছু কহিলেন মহারাজ?

লালটু বলল, না।

তাহলে 'হে' করলেন যে!

এমনি করেছি।

তারপর রমাকান্তর কান্নাটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে বলল, কুনকুনিয়ে কাঁদছিলাম তো, কান্না থামাতে গিয়ে একখানা হেচকি ওঠেছে। পুরোটা তুই শুনিসনি। শুধু 'হে'টা শুনেছিস। ও কিছু না।

তবে ঠিক আছে। জুত করে বইসেন।

কেন?

কুত্তাদের সঙ্গে কুস্তি লইড়ব।

বলিস কী?

সত্য বইলছি। এতকালের চেনা লোক আমরা আর আজ উহারা আমাদেরকে বাড়ি যেতে দিবে না! আপনি জুত করে বইসেন। আমি উহাদের দেখে লিব।

তারপরেই মুখে রে রে রে রে রে শব্দ তুলে, মাথাটা নিচু করে, শিং দুটো বাগিয়ে হঠাৎ করেই নেড়িদের দিকে প্রবল একখানা তাড়া লাগাল খয়রা। দেখে খি খি করে ভারি একটা আমুদে হাসি মাত্র হাসতে গিয়েছিল রমাকান্ত, কনুইয়ের গুতোয় লালটু তাকে থামাল। হেস না। আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ যেন পড়ে না যাই।

রমাকান্ত বিগলিত হয়ে চেপে ধরে রাখল লালটুকে ওদিকে খয়রার মতো আজদাহা গরুখানাকে অমন করে তেড়ে আসতে দেখে, তাদের প্রিয় সোনারং গায়ে যে একখানা ভূত ঢুকে যাচ্ছে সে কথা বেমালুম ভুলে গেল নেড়ির দল। খেউ খেউ ডাকটা তাদের মুহূর্তে নেমে গেল দশ পর্দা। খ'র জায়গায় ক হয়ে গেল। কেউ কেউ কেউ কেউ বলে দলভঙ্গ হল তারা। যে যেদিকে পারে ছুট লাগাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধংদেহি ভাব বদলে ফেলল খয়রা। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কান দুটো আগের মতোই নেতিয়ে লটর পটর করে ফেলল। লেজটা করে ফেলল দড়ির মতো। তারপর আনন্দের একটা শ্বাস ফেলল।

একা একটি গরু হয়ে অতগুলো নেড়িকে শায়েস্তা করেছে খয়রা, রমাকান্তর গ্রামে ঢোকার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, লালটু এবং রমাকান্ত দুজনার অতবড় দুশ্চিন্তা কাটিয়ে দিয়েছে দেখে এতটাই বিগলিত হয়েছে রমাকান্ত, এতটাই আনন্দিত হয়েছে, আনন্দে বাগবাগ হয়ে বেশ একখানা আদরের থাপ্পর মারল খয়রার পিঠে। কুলকুল একখানা হাসি হেসে অতি উৎসাহের গলায় বলল, সাবাস বাহে! সাবাস! থাপ্পরটা আদরের হলেও ভূতের থাপ্পর তো, যেখানে লেগেছিল জায়গাটা খয়রার জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'উহরে গিছিরে' বলে একখানা লাফ দিল খয়রা। সেই লাফের ধকল সইতে পারল না লালটু এবং রমাকান্ত, দুজনেই হুড়মড় করে পড়ল মাটিতে। ব্যাপারটি পাত্তা দিল না খয়রা। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, এতবড় একখানা কাজ কইরলাম, তার বাদেও আপনি আমাকে মারিলেন মহারাজ! আজি আপনাকে আর পিঠে লিব না। হেইটে বাড়ি যান আপনি।

বাদ্যকর বাড়ির সব চাইতে আজদাহা জোয়ান মর্দ বাদ্যকরটির নাম পালোয়ান। দেহখানা তার ঘুমঘুমির মাঠের দেবদারু গাছটির গুড়ির মতো। হাত পাগুলো যেন দেবদারু গাছের ডালপালা, মাথাখানা যেন বিশাল একখানা হাঁড়ি। চুলগুলো কদম ফুলের খাড়া হয়ে থাকা রেণুর মতো। চোখ দুটো হচ্ছে দুখানা রাজহাঁসের ডিম। থ্যাবড়া মোটা নাকের তলায় রামছাগলের লেজের মতো কুচকুচে কালো গোঁফ। গলায় কালো মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা গজার মতো চ্যাপ্টা একখানা তাগা। তাঁতীদের তৈরি লুঙ্গিতে তার শরীর ঢোকে না বলে বউর শাড়ি লুঙ্গির মতো করে পরে থাকে সে। তার সাইজের কোমরে বাঁধা যায় এমন গামছা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য বউর একখানা লাল শাড়ি গামছার মতো করে কোমরে বেঁধে রাখে সে। পালোয়ান যখন হাঁটে বাদ্যকর বাড়ির উঠোন থরথর করে কাঁপে।

কিন্তু পালোয়ানের বউটি হচ্ছে একেবারেই উল্টো। নাম যেমন শুটকি, দেখতেও সে তেমন শুটকো। এত রোগা পটকা, এত কাহিল, হেঁটে গেলে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো টালমাটাল হয়ে যায়। পায়ে পা লেগে ওষ্ঠা খায়। সামনের দিক থেকে জোরে বাতাস এসে সেই বাতাস তাকে ঠেলে নিয়ে যায় পেছনে, পেছন থেকে বাতাস এলে সে চলে আসে সামনে। প্রতি শীতেই বাড়ির লোক

আশা করে, এই বুঝি পটলটা তুলল শুটকি। কিন্তু তোলে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে আছে। আজ সন্ধ্যায় হল কী, লালটু সঙ্গে নেই দেখে গরুগুলো যে যার মতো বাড়ি ঢুকেছে। ঢুকে উঠোনে লেছড়ে বসেছে তিনটে গরু। আর কী কাণ্ড তিনটেই ঘোর কালো রঙের। সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে গায়ের রঙ একাকার হয়ে গেছে। তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই অন্ধকার উঠোনে অমন তিনখানা গরু বসে আছে।

শুটকি করেছে কি, রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল রাতের খাবার খেতে। উঠোনের মাঝামাঝি এসেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল একটি গরুর ওপর। পড়েই 'উলো মালো মা গেছিলো' বলে এক চিৎকার। চিৎকারের সঙ্গে দাঁত কপাটি লাগল তার। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল কুপিবাতি নিয়ে বেরুল। পালোয়ান নিজে বেরুল একখানা বিশাল টর্চ লাইট নিয়ে। তারপর উঠোনের তিনখানা কালো গরুও শুটকিকে দেখে যা বুঝার বুঝে গেল। লালটুর ওপর বেদম রাগল সে। অজ্ঞান বউর কথা ভুলে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, গরুগুলোকে একা ছেড়ে দিয়েছে হারামজাদা। আজ আসুক একটানে কল্লাটা ওর ছিঁড়ে ফেলব।

খয়রা হেলে দুলে গোয়ালের দিকে যাচ্ছে। পালোয়ান হুংকার দিয়ে উঠল–

তবে রে পাপিষ্ঠ
হইলি কেন ভূমিষ্ঠ
করতে সবার অনিষ্ট
দেখতে তুই শান্তশিষ্ট
আসলে তুই লেজ বিশিষ্ট

পালোয়ানের স্বভাব হচ্ছে অতিরিক্ত রেগে গেলে কথা বলে ছড়ায় ছড়ায়। মিলুক বা না মিলুক ছড়ার মতো টেনে টেনে কথা বলে যাবে সে। এখনও তাই করল। দেখে বেজায় ভড়কাল খয়রা। কিছুতেই বুঝতে পারল না তার অপরাধ কী, পালোয়ান সাহেব অমন তড়পাচ্ছেন কেন? বাড়ি ফিরে গোয়ালে তো খয়রা যাবেই, গোয়ালই তো গরুদের বসবাসের জায়গা, সেখানে যাওয়া কী অন্যায়! তাহলে?

পালোয়ানের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাবে খয়রা তার আগেই বিশাল থাবায় তার লেজটা ধরল পালোয়ান। দাঁতে দাঁত চেপে বলল–

কল্লাখানা তোর
ছিঁড়ব ফরফর

তারপরই একটু থতমত খেল পালোয়ান। কিন্তু গলার জোর কমাল না। হুহুংকারের স্বরেই বলল–

একি কাণ্ড হে
কল্লাখানা মানুষের নাকি রে?

আসলে হয়েছে কী, রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে পালোয়ান! খয়রাকে লালটু মনে করেছে। খয়রার লেজ মুঠোতে ধরে ভেবেছে লালটুর কল্লা ধরেছে। কিন্তু মানুষের কল্লা কি গরুর লেজের মতো সরু হতে পারে! হাতে যে বিশাল একখানা টর্চলাইট আছে সেই জিনিসখানা জ্বালাতে ভুলেই গেছে পালোয়ান। ফলে এরকম ভুল তার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মুহূর্তেই বুঝল খয়রা। বুঝে খুবই আমুদে গলায় বলল, 'পাহ্লান জি আমি নহি'।

এই বাড়িতে খয়রার ভাষা লালটু ছাড়া আর কেউ বোঝে না। লালটু ছাড়া অন্য সবার কাছে খয়রার ভাষা মানে গরুর ডাক। হাম্বা স্বর। পালোয়ানও সেই স্বরই শুনল। শুনে সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বালল, জ্বেলে একেবারে বেকুব হয়ে গেল। লালটুর কল্লা ভেবে সে ধরে আছে গরুর লেজ। ছ্যা ছ্যা ছ্যা।

এমনিতেই মেজাজ খারাপ, তার ওপর এই কাণ্ড! পালোয়ান আরও রাগল, আরও বিরক্ত হল। খয়রার লেজ ছেড়ে দশদিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল সে–

সে বজ্জাত কোথা
মুখটি যাহার থোতা?

লালটু আর রমাকান্ত তখন মাত্র বারবাড়িতে পা দিয়েছে, শোনে এই হুংকার। শুনে যা বোঝায় বুঝে গেল লালটু। গরুগুলো বাড়ি ফিরে নিশ্চয় কোনও অঘটন ঘটিয়েছে, এজন্য রেগেছে পালোয়ান। এখন যদি লালটুকে হাতের কাছে পায় তাহলে এক আছাড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে ছাড়বে।

ভয়ে গলা শুকিয়ে আমড়া কাঠের ঢেঁকি হয়ে গেল লালটুর। পা দুখানা যেন মাটির ভেতর গেঁথে গেল। সেই পা নড়াবার শক্তি রইল না তার।

পালোয়ানের হুংকারটা রমাকান্তও শুনেছিল। মানুষের হুংকার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই তার। তাদের ভূত গাঁয়ে কোনও কোনও ভূত এরকম হুংকার ছেড়ে গান

গায়। শুনলে মনে হয় খেয়াল কিংবা ঠুমরি হচ্ছে। শুনে আহ্লাদে মুণ্ডু দোলাতে থাকে অন্যান্য ভূত। রমাকান্ত একটু গানপাগল ভূত। ভূতদের যে কোনও ধরনের গান শুনলে মুহূর্তে চোখ ঢুলু ঢুল হয়ে যায় তার। নিজের অজান্তেই দুলতে থাকে মুণ্ডুখানা। আর থেকে থেকে সমঝদার শ্রোতার মতো 'আহাহাহা উহুহুহু' করে ওঠে।

এখনও তাই হল। পালোয়ানের হুংকার শুনে লালটুর পাশে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাতে লাগল রমাকান্ত, দুতিনবার 'আহাহাহা, উহুহুহু' করে ওঠল। লালটু কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলল, কে গান গাহে হে, কণ্ঠখানা মনোহর!

এতটা ভয় পাওয়ার পরও রমাকান্তর কথা শুনে রেগে গেল লালটু। পান চিবানোর মতো চিবিয়ে বলল, গান না ছাগল, রাগ।

রমাকান্ত কেলানও একখানা হাসি হেসে বলল, ওই তো, তুমি ভেবেছ আমি বুইঝতে পারিনি, পেরেছি। রাগপ্রধান গান।

এবার আরও রাগল লালটু। আরে না গাধা, এই বাড়িতে একজন পালোয়ান আছে, সে আমার ওপর আজ রেগেছে, হাতের কাছে পেলে আমাকে এমন মারবে, আমার দফা রফা করে ছাড়বে।

মারের কথা শুনে রমাকান্তও খুব ভয় পেল। মাথা দোলান বন্ধ করে ঢোক গিলে বলল, কেন রেইগেছে? কেন মাইরবে তোমাকে?

গরুগুলো আগে বাড়ি চলে এসেছে। গোয়ালে না গিয়ে নিশ্চয় উঠোনের দিকে চলে গেছে কোনও গরু। ওই নিয়ে বোধহয় কোনও কেলেংকারি হয়েছে।

তাহলে কী কইরবে এখন?

তাই তো বুঝতে পারছি না। বাড়ি কব কেমন করে? পালোয়ান তো আমাকে মেরে ফেলবে।

তারপরই রমাকান্তর ওপর ঝাল ঝাড়তে লাগল লালটু। এসবের জন্যে তুমি দায়ী। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে এমন হত না। খয়রাদের নিয়ে প্রতিদিনকার মতো বাড়ি ফিরে আসতাম আমি। এখন কী করব? কেমন করে বাড়ি ঢুকব?

বাড়ি তাহলে ঢুইক না।

থাকব কোথায়?

চল ঘুমঘুমির মাঠে চইলে যাই। সেথা দেওদারু তলায় ঘুমাবে।

রাতেরবেলা ঘুমঘুমির মাঠে যাবে কোন মানুষ এবং দেবদারু তলায় ঘুমিয়ে থাকবে, ভাবাই যায় না।

আমি কি ভূত যে গাছতলায় ঘুমাব?

তা বটে! তুমি ভূত নহ।

তারপরই হঠাৎ করে বেশ খুশি হয়ে গেল রমাকান্ত। লালটুর কাঁধে হাত দিয়ে খে খে করে ভারি আমুদের একখানা হাসি হেসে বলল, লাটলু ও লাটলু, আমার মাথায় একখানা বুদ্ধি খেলিছে। বেজায় মনোহর বুদ্ধি। আমি তোমার রূপ ধইরে ওই যে পাহলান না কী বইললে উহার সামনে যাই, আর তুমি সেই ফাঁকে চইলে যাও ভিতর বাড়ি, গিয়ে কর্মকাণ্ড যাহা আছে সেইরে ফেল। বাদে দেখা হবে।

বুদ্ধিটা খুবই পছন্দ হল লালটুর। তবু চিন্তিত গলায় সে বলল, কিন্তু পালোয়ান তো তোমাকে বেদম মারবে।

রমাকান্ত আবার খে খে করে হাসল। সে মার আমার গায়ে লাইগবে না।

এবার আহ্লাদে একেবারে নখানা হয়ে গেল লালটু। তাহলে তাই কর। পালোয়ানের হাতে আমার মারটা খেয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে এস, দুজনে একত্রে বসে রাতের ভাতটা খাব।

তথাস্তু।

তারপরই লালটু হয়ে গেল রমাকান্ত। মুহূর্তের জন্য আসল লালটুর পাশে দাঁড়াল, তারপর একজন চলল পালোয়ানের দিকে, আরেকজন ভেতর বাড়ির দিকে।

গোয়ালঘরের আশেপাশে টর্চ জ্বেলে লালটুকে খুঁজছে পালোয়ান আর হুংকার ছাড়ছে–

যদি একবার পাই
হাড়গোড় চিবিয়ে খাই।

পালোয়ানের হাতের কাছে দাঁড়িয়ে রমাকান্ত বলল, তাই নাকি ভাই!

কে, কে তার সঙ্গে ছড়া মিলাল!

পালোয়ান বেশ থতমত খেল। তারপরই লালটুকে দেখতে পেল তার একেবারে হাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কোন ফাঁকে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে লালটু? পালোয়ান কেন দেখতে পায়নি?

কিন্তু এখন ওসব ভাবার সময় নেই পালোয়ানের। লালটুকে দেখেই রাগে থরথরিয়ে উঠল সে। ডান হাতে টর্চ জ্বলছে, এজন্য ডান হাতটা সে ব্যবহার

করতে পারল না, বাঁ হাতে পেল্লায় একখানা চড় কষাল লালটুর গাল বরাবর। কিন্তু কী আশ্চর্য, চড়টা লালটুর গায়ে লাগল না, লাগল এসে তার নিজের ডান কাঁধ বরাবর এবং এত জোরে, নিজের চড় খেয়ে নিজেই প্রায় ছিটকে পড়ছিল পালোয়ান, কোনোরকমে নিজেকে সামলাল। তবে টর্চখানা সামলাতে পারল না, দূরে কোথায় ছিটকে পড়ে নিভে গেল সেটা। গভীর অন্ধকারে ভরে গেল চারদিক। দেখে কুলকুলে একখানা হাসি হাসল রমাকান্ত।

একে লালটুকে মারা চড় নিজের গায়ে এসে লেগেছে পালোয়ানের, তার ওপর লালটুর (রমাকান্তর) অমন হাসি, অপমানে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল পালোয়ান। 'তবে রে এ এ এ এ এ এ ' বলে দুহাতে টিপে ধরল লালটুর গলা। ধরে এমন চাপ দিল যেন মুহূর্তেই ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে লালটুর।

কিন্তু পালোয়ানের নিজের শ্বাস প্রশ্বাস কেন বন্ধ হয়ে আসছে! ব্যাপারখানা কী! তারপরই পালোয়ান বুঝতে পারল বেশ বড় রকমের একটা ভুল হয়ে গেছে তার। লালটুর গলা ভেবে সে নিজের গলাই টিপে ধরেছে। নিজেকেই মেরে ফেলতে বসেছে। ভেতরে ভেতরে খুবই লজ্জা পেল পালোয়ান। ছ্যা ছ্যা ছ্যা, এসব কী হচ্ছে আজ!

তখন আবার কুলকুল করে হাসতে শুরু করেছে রমাকান্ত। এই হাসি শুনে রাগে আবার থরথরিয়ে উঠল পালোয়ান। এবার আর হাত ব্যবহার করল না সে, করল পা। দুপা একত্র করে এমন একখানা লাথি মারল লালটুকে (রমাকান্তকে), এরকম লাথি মারার সময় পুরো শরীর শূন্যে উঠে যায় মানুষের, পালোয়ানেরও উঠল কিন্তু উঠে আর পড়ল না, অমন আজদাহা দেহখানা নিয়ে শূন্যে ভেসে রইল সে।

পালোয়ান খানিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে কী। লালটুকে নিয়ে যাই করছে হচ্ছে তার উল্টো। চড় মরল লালটুকে সেই চড় কিনা বেজায় জোরে এসে লাগল তার নিজের গালে! এসব কথা তো কাউকে বলা যায় না, লজ্জার কথা, নিজের চড় খেয়ে নিজের মাথাটা ঘুরে গেছে পালোয়ানের। এত জোর হাতে চড় জীবনে খায়নি সে। মাথাটা এখনও গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো একবার এদিক একবার ওদিক করছে। পালোয়ানের গায়ে কি এত জোর! মনে তো হয় না।

নিজের গালে নিজের চড় খেয়ে নিজের গায়ের জোর নিয়ে ভারি একটা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল পালোয়ান। না, এত জোর তো তার গায়ে থাকবার কথা নয়। মানুষের গায়ে এত জোর থাকে না, এত জোর থাকে ভূতের গায়ে। পালোয়ান নিজে মানুষ তো, নাকি ভূত হয়ে গেছে!

কিন্তু জ্যান্ত মানুষ ভূত হয় কী করে! কোনও কোনও বদলোক মরে ভূত হয়। সত্যি কথা বলতে কী, লালটুর গলা টিপে ধরার আগে গোপনে নিজের গায়ে একটা রামচিমটি কেটে দেখেছে পালোয়ান। মানুষ হলে ব্যথা পাবে, ভূত হলে পাবে না। মানুষের শরীর থাকে, ভূতের কোনও শরীর থাকে না।

কিন্তু ব্যথা পালোয়ান পেয়েছে। পেয়ে সন্দেহটা তার একদম কেটে গেছে। না, সে তো ভূত হয়নি, সে তো মানুষই আছে। লালটু বজ্জাতটা তার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছে।

তারপরই লালটুর গলা টিপে ধরেছে পালোয়ান। ধরে এমন জোর খাটিয়েছে, রাগের ঘোরে ছিল তো বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী হচ্ছে। যখন দেখে নিজেরই তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছাতি ফেটে যাবে, ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নিজের গলা টিপে ধরেছে পালোয়ান, নিজেকে মেরে ফেলতে বসেছে।

আরে, হচ্ছে কী এসব!

কী করে হচ্ছে!

কিন্তু নিজে যে পালোয়ান ভূত হয়নি, মানুষই আছে এটা তো সে খানিক আগে রামচিমটি খেয়ে প্রমাণ করেছে। সুতরাং ভয় নেই। রাগের ঘোরে আছে বলে পর পর দুবার ভুল হয়েছে তার। কিন্তু তিনবারের বার আর ভুল হতে পারে না। পালোয়ান ভাবল এবার দুপা একত্র করে লালটুকে একটা লাথি মারবে সে। দুপায়ে মারা লাথি তো আর যারটা তার নিজের গায়ে লাগতে পারে না!

কিন্তু লাথিটা মেরে একেবারেই বেকুব হয়ে গেল সে। আজদাহা দেহটা তার শূন্যে যে উঠল উঠলই। মাটিতে পড়ার আর নাম নেই।

এ কী করে সম্ভব!

মানুষের শরীর এভাবে হাওয়ায় ভেসে থাকে কী করে!

পালোয়ান সত্যি সত্যি মানুষ আছে তো! মরে হেজে ভূত হয়ে যায়নি তো!

কিন্তু কোন ফাঁকে হবে! মরে গেলে টের পেত না!

চড় খাওয়া মাথাটা এমনিতেই গোত্তা খাচ্ছে তার, টিপে ধরা গলাটা এমন ব্যথাচ্ছে, ঠিকঠাক মতো শ্বাস নিতে পারছে না, তার ওপর দেহটা আছে শূন্যে ভেসে। হচ্ছে কী এসব!

কিন্তু পালোয়ান বলে কথা! সে তো আর হেজিপেজি কেউ নয় যে ভয়ে একেবারে টাসকা লেগে যাবে! ভাসমান অবস্থায় ব্যাপারটা নিয়ে খুবই মন দিয়ে ভাবতে লাগল সে।

আসলে এসব হচ্ছে রমাকান্তর কাণ্ড। লালটু মনে করে রমাকান্তকে যখন চড় মারতে গেছে পালোয়ান, আস্তে করে পালোয়ানের হাতটা তার নিজের গালের দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছে রমাকান্ত। সুতরাং নিজের হাতের চড় নিজের গালেই লেগেছে পালোয়ানের। তারপর যখন গলা টিপে ধরতে গেছে তখনও একই কাণ্ড করেছে। কিন্তু দুপায়ে লাথি মারতে গেছে তখন কী করবে হঠাৎ করে বুঝতে না পেরে রমাকান্ত করেছে কি নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙুল বড়শির মতো বাঁকা করে পালোয়ানের কোমরে শক্ত করে বেঁধে রাখা গামছার (আসলে বউর শাড়ি) ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। দিয়ে ছোট্ট শিশুরা যেমন খেলনা বড়শিতে পুঁটিমাছ তোলে ঠিক সেই কায়দায় পালোয়ানকে তুলেছে শূন্যে। তুলে খানিক চুপ করে থেকেছে তারপর খে খে করে হাসতে শুরু করেছে। এরকম বিটকেলে হাসি শুনে পালোয়ান আর একটু বেকুব হল। রাগটা তো তার ছিলই সে রাগ আর একটু বাড়ল। চিৎকার করে বলল–

কে বটে হে
খে খে করে হাসে রে?

সঙ্গে সঙ্গে রমাকান্তও ছড়া মিলাল–

তোমার বাপ বটে হে
এমন করে হাসে যে।

তারপরই পালোয়ানকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার পেটের দুপাশে কাতুকুতু দিতে লাগল রমাকান্ত। এই জায়গায় বেজায় সুড়সুড়ি পালোয়ানের, বাড়ির সবাই তা জানে। কিন্তু রমাকান্ত জানত না। সে দিয়েছে আন্দাজেই কিন্তু দিয়েই ভারি মজা পেয়ে গেল। শূন্যে ভাসমান পালোয়ান কাতুকুতু খেয়ে কাটা কই মাছের মতো তড়পাতে লাগল আর শিশুর মতো কুলকুল স্বরে খি খিখিখি খি খিখিখিখি করে হাসতে লাগল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে হাত পা ছুঁড়ে কুটিপাটি সুরে বলতে লাগল, এই লালটু, এই, এমন করিসনে বাপ, এমন করিসনে, ছেড়ে দে, খি খিখিখিখি। দেখ মরে যাব, হাসতে হাসতে একদম মরে যাব, খি খিখিখিখি।

রমাকান্ত দেখল এই এক সুযোগ, এই সুযোগে পালোয়ানের কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করা যাক।

অবিকল লালটুর গলায় রমাকান্ত বলল, আর কখনও আমার সঙ্গে এমন করবে?

সঙ্গে সঙ্গে পালোয়ান বলল, না করব না বাপ। মাইরি বলছি। কোনদিন করব

না। খি খিখিখি।

আমাকে চড়চাপড় মারা তো দূরের কথা রাগ পর্যন্ত করতে পারবে না।

খি খিখি, করব না, করব না বাপ। খি খিখি।

সত্যি?

সত্যি। খি খি।

মনে থাকে যেন!

থাকবে। খি।

তারপরই কড়ে আঙুলটা আলগা করল রমাকান্ত, ধপাস করে মাটিতে পড়ল পালোয়ান। পড়ে বেশ একটা ব্যথা পেল। তবে কাতুকুতুর ভয়ে সেই কথা সে চেপে থাকল।

রমাকান্ত বলল, এখন আর আর একটা কাজ করতে হবে।

পালোয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলল, কী কাজ বাপ?

বল করবে। না করলে কিন্তু আবার কাতুকুতু দেব।

শুনে পালোয়ান একেবারে আঁতকে উঠল। না না, কাতুকুতু দিতে হবে না। করব। কী কাজ?

কানে ধরে একশোবার উঠ বস করতে হবে।

উঠ বস? একশো বার? কেন?

আমার সঙ্গে যে অন্যায় করেছ তার শাস্তি।

শাস্তি তো অনেক দিয়েছিস বাপ, আবার উঠ বস কেন?

ব্যাপারটা তুমি যাতে ভুলে না যাও।

তবু উঠ বস শুরু করল না পালোয়ান। গড়িমসি করতে লাগল।

রমাকান্ত বলল, কী হল? কাতুকুতু দেব?

না না। বলেই উঠ বস শুরু করল পালোয়ান। কিন্তু কানে ধরার কথা তার মনে ছিল না রমাকান্ত বলল, এভাবে না। কানে ধরে।

পালোয়ান দুহাতে তার দুকান ধরল। ধরে উঠ বস করতে লাগল। সামনে দাঁড়িয়ে গুনতে লাগল রমাকান্ত।

এক, ভাল হাতে শেখ।

দুই, কী করবি তুই?

তিন, বাজবে তোমার বিন্।

চার, খাবি বেদম মার।

জ্ঞান ফেরার পর শুটকি দেখে তার স্বামী পালোয়ান ঘরে নেই। ধরফর করে বিছানায় উঠে বসল সে। তারপর একে একে সব কথা মনে পড়ল তার এবং বেজায় খিদে পেল। আসলে রাতের খাবার খেতেই রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল সে। উঠোনে কালো ভুষো মতো কী একটা জন্তুর ওপর হুড়মুড় করে পড়েছিল, পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। এখন শুটকি বুঝতে পারল জন্তুটা আর কিছু নয় এই বাড়ির কালো গরুগুলোর একটি। ছাড়া পেয়ে উঠোনে এসে বসেছিল। ছি ছি! গরুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল সে! কী লজ্জা!

তবে লজ্জার চে, খিদেটা বেশি পেয়েছে বলে ঘরের ভেতর জ্বলতে থাকা হারিকেনটা হাতে নিয়ে বেরুল শুটকি। এখন উঠোনে আর কোনও কালো গরু বসে নেই। ফাঁকা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল শুটকি। রান্নাঘর বসে আস্তে ধীরে ভাত খাচ্ছে লালটু। দেখে একটু বিরক্ত হলো সে। ইস, এত খিদে পেয়েছে তার আর এখনই কিনা রান্নাঘরে বসে খাচ্ছে লালটু। বাড়ির বউ হয়ে সে তো আর বাড়ির রাখালের সঙ্গে বসে ভাত খেতে পারে না। তার চে স্বামীকে খুঁজে এনে তার সঙ্গে বসে খাবে।

তিতিবিরক্ত স্বরে শুটকি বলল, এই লালটু আমার উনি কোথায় রে?

এই বাড়িতে বউরা যে স্বামীর নাম ধরে ডাকে না এটা লালটু জানে। শুটকির 'আমার উনি' মানে হচ্ছে পালোয়ান।

ভাত খাওয়া থামিয়ে হাসিমুখে লালটু বলল, তাকে তো দেখলাম গোয়ালঘরের দিকে।

কী করে?

জানি না

তারপর আর কোনও কথা বলল না শুটকি, গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু গোয়ালঘরের সামনে এসে আবার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল শুটকির। হারিকেনের আলোয় শুটকি দেখতে পেল দুহাতে দুকান ধরে উঠ বস করছে তার স্বামী আর তার সামনে দাঁড়িয়ে গুনছে লালটু। লালটুকে তো সে দেখে এল রান্নাঘরে বসে ভাত খাচ্ছে, তার সঙ্গে কথাও বলল, তাহলে এখানে এল কী করে? কখন এল?

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুটকি তারপর একবার পালোয়ানের দিকে আর একবার লালটুর দিকে, আসলে রমাকান্ত দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু ওদের দুজনের একজনও শুটকিকে খেয়াল করল না। জলজ্যান্তর একজন মানুষ হারিকেন হাতে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, না পালোয়ান না রমাকান্ত কেউ তা দেখতে পেল না। পালোয়ান তার কান ধরে ওঠ বস নিয়ে ব্যস্ত আর রমাকান্ত গোনা নিয়ে। মাত্র উনিত্রিশ অব্দি গোনা হয়েছে, এতেই পালোয়ানের আজানাহা দেহখানা ভিজে একোবারে জলে ডোবা হোদল কুতকুতে একখানা ভোঁদর হয়ে গেছে। প্রথমে ঘেমেছে তার মাথাখানা। প্রতিটি চুলের গোড়া দিয়ে ঠেলে বেরুচ্ছে তিরতিরে ফোয়ারার মতো ঘাম। বেরিয়ে দরদর করে কানের দুপাশ, ঘাড় এবং গলা বেয়ে নামছে। নেমে সোজা মাটিতে পড়ছে। যে জায়গাটায় ওঠ বস করছে সে সেই জায়গার মাটি মাত্র উনত্রিশবার ওঠ বস করার ফলেই ভিজে একেবারে কাঁদা কাঁদা হয়ে গেছে। কিছু ঘাম দুচোখের কোল ছাড়িয়ে গাল বেয়ে এমন ভঙ্গিতে নেমেছে দেখে যে কেউ ভাববে পালোয়ান বুঝি মনের দুঃখে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

শুটকিরও ঠিক এই কথাটাই মনে হল। আহা, স্বামীটা তার কাঁদছে! কেন কাঁদছে! কেন এমন করে ওঠ বস করছে কেনই বা কাঁদছে!

তারপরই মনে হল, বোধহয় স্বামীটি তার ব্যায়াম করছে। লালটুকে গোনার দায়িত্ব দিয়ে নিজে ওঠ বস করছে। ভেবে মুখে কাতুকুতু খাওয়া আমুদে ধরনের একখানা নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল শুটকির। ভালো, ব্যায়াম করা খুব ভালো। ব্যায়াম করলে দেহখানা তরতাজা থাকে। হাঁটাচলা করলে ঝরঝরা লাগে।

কিন্তু ব্যায়াম করার সময় তো কেউ কাঁদে না। রোজই সকাল বিকাল পালোয়ানকে সে ব্যায়াম করতে দেখে। হাত পা দাপড়ে নানা প্রকারের কসরৎ করে, ওঠ বস করে কিন্তু কাঁদে না তো। আজ অমন হাপুস নয়নে কাঁদছে কেন! এতকাল হল বিয়ে হয়েছে শুটকির, কখনও তো স্বামীকে সে কাঁদতে দেখেনি। যার ভয়ে সারাবাড়ি, সারাগ্রাম তটস্থ, যার ভয়ে বাড়ির মানুষ সারা গ্রামের মানুষ প্রায় কাঁদছে, আজ কিনা সেই মানুষের গাল বেয়ে নেমেছে কান্না! এ কী করে সম্ভব! তা ছাড়া স্ত্রী হয়ে স্বামীর এই ধরনের কান্না কী করে সহ্য করে শুটকি! তারও প্রায় কান্না পেয়ে গেল। গলাটা ভিজে গোবরের মতো গ্যাদগ্যাদে হয়ে গেল। খুবই অহ্লাদী ভঙ্গিতে পালোয়ানের ডান বাহুর কাছে হাত ছোঁয়াল শুটকি। কী হয়েছে গো তোমার? এমন করে কাঁদছ কেন গো?

সঙ্গে সঙ্গে চমকে গোনা বন্ধ করল রমাকান্ত। হারিকেন হাতে শুটকিকে দেখতে পেল। দেখে বুঝতে পারল না এখন কী করবে সে, কোথায় লুকাবে। লালটু হয়ে এক দুমিনিট এখানে এখন দাঁড়িয়ে থাকলে কেচ্ছা কেলংকারি হয়ে যাবে। স্বামীর এহেন অপমান দেখে শুটকি নিশ্চয় লালটুর ওপর হম্বিতম্বি শুরু করবে। শুটকির গলা শুনে বাড়ির অন্যান্য লোক ছুটে আসবে গোয়ালঘরের দিকে। আসল লালটুও আসবে। পাশাপাশি দুজন লালটুকে দেখলে, না, তারপর আর ভাবতে পারে না রমাকান্ত। তাড়াহুড়ো করে সাপের রূপ ধরল সে। হাতপাঁচেক লম্বা ঝিম কালো একখানা শংখচূড় হয়ে গেল। হয়ে সুরুৎ করে গোয়ালঘরের বেড়ার পাশে মাটিতে গা মিশিয়ে পড়ে রইল।

এদিকে শুটকির অমন গ্যাদগ্যাদে গলার কথা শুনে ওঠ বস বন্ধ করেছে পালোয়ান, ফ্যাল ফ্যাল করে শুটকির মুখের দিকে তাকিয়েছে। তাকিয়ে কী যে হলো তার, কোনও কোনও শাস্তি পেতে থাকা আদুরে শিশু হঠাৎ করে মাকে দেখলে কিংবা মায়ের গলা পেলে যেমন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে ঠিক তেমন করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না গো। লালটু কেন এমন শাস্তি দিচ্ছে আমাকে। কোথায় আমি চাইলাম আমি ওকে শাস্তি দিতে ও উল্টো দিচ্ছে আমাকে। পালোয়ান হয়েও কিছুই করতে পারছি না আমি।

এতক্ষণ ধরে যেসব কাণ্ড রমাকান্ত করেছে তা একটার পর একটা বলতে গেল পালোয়ান। কী ভেবে মুখে কুলুপ আঁটল! বলল না। ওইটুকু একটি পুঁচকে ছোঁড়া হাতির মতো শক্তিশালী পালোয়ানকে এই এতটা ক্ষণ ধরে যে ধরনের নাকানি চোবানি খাইয়েছে, যার সামান্যতম ভদ্রতা জ্ঞান আছে তার পক্ষে কিছুতেই সে কথা কাউকে বলা সম্ভব নয়। আর যাই হোক পালোয়ান মানুষটা তো ভদ্রলোক। কিন্তু বউর সামনে এমন করে যে কাঁদল পালোয়ান এটা কেমনতর ভদ্রতা হল! ছ্যা ছ্যা ছ্যা! বউটা তাকে ভাববে কী! ধকল তো এতক্ষণ ধরে শরীরের ওপর দিয়ে গেছেই, এখন মান সম্মানটাও বুঝি যায়।

মোটা মানুষেরও বুদ্ধি কখনও কখনও বেশ সরু হয়। হঠাৎ করে ভালো রকমের কোনও কোনও চালাকি তারা করে ফেলতে পারে। পালোয়ানও তেমন একখানা চালাকি করল।

কথা নেই বার্তা নেই শুটকির মুখের দিকে তাকিয়ে খে খে করে হাসতে লাগল। এত জোর সেই হাসির, ঘামে ভেজা ভোঁদরের মতো হোদল কুতকুতে দেহখানা

হাসির তোড়ে আকুপাকু করতে লাগল। এই এমন হাপুস নয়নে কাঁদছিল মানুষটা আর এখন কিনা অমন করে হাসছে, ব্যাপারখানা কী? হঠাৎ করে পাগল হয়ে যায়নি তো পালোয়ান! মোটা লোকরা বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে নাকি এমন করে হাসে!

নাকি ভূতে ধরেছে পালোয়ানকে!

গোয়ালঘরের পেছনে একশো সোয়াশো বছরের পুরনো একখানা তেঁতুল গাছ। এতকালের পুরনো গাছে ভূত না থেকে পারে না। এরকম সন্ধেবেলা একা পেয়ে পালোয়ানের ওপর আছর করেনি তো তেঁতুলভূত।

কিন্তু পালোয়ান তো এখানে একা ছিল না। সঙ্গে তো লালটুও ছিল। দুজন মানুষ নাকি এক সঙ্গে থাকলে ভূত তাদের কাছে ভিড়ে না!

তাহলে?

খুবই চিন্তিত মুখে পালোয়ানের মুখপানে তাকিয়ে রইল শুটকি। খে খে করা হাসিটা হাসতে হাসতে পালোয়ান বলল, বুঝলে গো, বুঝলে, তোমার সঙ্গে একটু মশকারা করলাম। প্রথমে ওঠ বস, তারপর কান্না, তারপর হাসি। আসলে ব্যায়াম করছিলাম। এটাকে বলা হয় বঠকি। কেতাবি বাংলায় বৈঠক। আমি বঠকি মারছিলাম আর লালটু গুনছিল। তাই নারে লালটু?

বলেই এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়ে গুনছিল রমাকান্ত সেদিকে তাকাল পালোয়ান। তাকিয়ে বেকুব হয়ে গেল। সেখানে কেউ নেই। কোথায় গেল? কোন ফাঁকে গেল? দুজন মানুষের চোখের সামনে থেকে, হাতের এত কাছ থেকে একজন মানুষ কেমন করে উধাও হয়?

পালোয়ানের চোখ অনুসরণ করে শুটকিও তাকিয়েছে। কিন্তু লালটু নেই। পালোয়ান এবং শুটকি দুজন পরস্পর বোকা চোখে দুজনার দিকে তাকিয়েছে। পালোয়ান বলল, এখানেই তো ছিল। কোথায় গেল? ওরে লালটু, কোথায় গেলি বাপ?

পালোয়ান এবং শুটকির দশা দেখে, কথাবার্তা শুনে গোয়ালঘরের বেড়ার সঙ্গে নিঝুম হয়ে সেঁটে থাকা শঙ্খচূড় রমাকান্তর তখন বেজায় হাসি পাচ্ছে। অনেকক্ষণ হাসিটা পেটে চেপে রাখল সে। শেষ পর্যন্ত পারল না। পেট ফেটে গলগল করে বেরুল হাসি। কিন্তু সে তো এখন মানুষ নয়, সাপ। সাপের হাসি তো আর মানুষের মতো হয় না। রমাকান্তর হাসিটা হলো হিসসসসস অর্থাৎ প্রায় ফণা তোলা বিষধর সাপের মতো। সেই শব্দ শুনে পালোয়ান ভাবল বুঝি গোয়ালঘরের

আড়ালে লুকিয়েছে লালটু। তার সঙ্গে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছো' খেলছে এবং ওইভাবে আওয়াজ দিচ্ছে। শুটকির মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসে গলায় পালোয়ান বলল, ওই যে শোন, আওয়াজ দিচ্ছে। বেহেড চালাক ছোকড়া। লুকিয়েছে, রসো বাছা, কানামাছি খেলার সাধ এখুনি দেখাচ্ছি। ঘামটা একটু মুছে নিই।

কোমর থেকে গামছার কায়দায় বেঁধে রাখা শাড়িখানা খুলল পালোয়ান। তারপর মুখ গাল মুছে শাড়িটা দলাই মলাই করে দিল শুটকির হাতে। এটা তোমার কাছে রাখ। আমি ব্যাটাকে ধরছি।

পালোয়ানের মোছা ঘামে শাড়িটা তখন একেবারে জ্যাব জ্যাবে ভেজা। হাতে নিয়ে শুটকির মনে হলো জলে চুবিয়ে জিনিসটা কেউ তার হাতে দিয়েছে।

কিন্তু শুটকি কোনও কথা বলল না। অনেকক্ষণ ধরেই বাকরুদ্ধ হয়ে আছে সে। ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে স্বামীর কাণ্ডকারখানা দেখছে সে।

পালোয়ান তখন শিশুর মতো আমুদে ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছে। খানিকদূর গিয়েই শঙ্খচূড় রমাকান্তর লেজ বরাবর পায়ের একটা আঙুলের সামান্য অংশের ছোঁয়া লাগল পালোয়ানের। সেই ছোঁয়ায় এমন রাগ হল রমাকান্তর, শরীরের যাবতীয় রক্ত মাথায় লাফিয়ে ওঠল তার। আসলে রমাকান্ত তো এখন আর রমাকান্ত নয়, বিষধর রাগী সাপ শঙ্খচূড়। এই সাপের রাগ বড় ভয়ঙ্কর! হয়ত গরমকালে কোন গাছের মিঠেল ছায়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে শঙ্খচূড়, এমন সময় গাছের একখানা পাতা ঝরে পড়ল তার ওপর, রেগে সঙ্গে সঙ্গে পাতাটাকেই ছোবল মারল সে। পালোয়ানের পায়ের ছোঁয়ায় ঠিক তেমন একখানা ভাব হল শঙ্খচূড় রমাকান্তর। হিসসস করে পালোয়ানকে ছোবল দেয়ার জন্য লাফিয়ে উঠল সে। লাফটা একটু বেশি জোরে দিয়ে ফেলেছিল। ফলে পালোয়ানের মাথা ছাড়িয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। ছোবল তো লাগলই না, পালোয়ানের দেহ ছুঁতে পর্যন্ত পারল না। ওপরে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মালার মতো গোল হয়ে পড়ল পালোয়ানের গলায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও কেন যেন পড়ে গেল শঙ্খচূড় রমাকান্তর। হাতের কাছে পেয়েও ছোবল দিতে ইচ্ছে করল না পালোয়ানকে।

এদিকে হয়েছে কি, সাপের শরীর তো সব সময় ভেজা শাড়ি গামছার মতো ঠাণ্ডা হয়, পালোয়ান ভেবেছে শুটকি বুঝি খানিক আগে তার কাছে রাখতে দেয়া পালোয়ানের কোমরে বাঁধার ভেজা শাড়িটা ছুঁড়ে মেরেছে। অভ্যেসবসত কাঁধ

থেকে জিনিসটা নিয়ে কোমরে প্যাচ দিয়ে বাঁধতে গেল সে। কিন্তু পালোয়ানের কোমর বলে কথা, পাঁচ হাত লম্বায় তো সে কোমর বেড় পাওয়ার কথা নয়। বার কয়েক চেষ্টা করে বিরক্ত ভঙ্গিতে শুটকিকে পালোয়ান বলল, ওগো, গামছাখানা (এই শাড়িটিকে পালোয়ান বলে গামছা) এত ছোট হলো কী করে?

ঠিক তখুনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে লালটু এসে দাঁড়াল পালোয়ান এবং শুটকির মাঝখানে। শুটকির হাতে ধরা হারিকেনের আলোয় দেখতে পেল মিশমিশে কালো একখানা সাপ কোমরে বাঁধবার চেষ্টা করছে পালোয়ান। দেখে সব ভুলে চিৎকার করে উঠল লালটু। সাপ, সাপ।

জগত সংসারের এই একখানা জীবকে বেজায় ভয় পায় পালোয়ান। এই একটি ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে তার খুব মিল। শুটকিও যারপরনাই ভয় পায় সাপকে। সুতরাং আচমকা লালটুর মুখে অমন সাপ সাপ চিৎকার শুনে একসঙ্গে আঁতকে উঠল তারা দুজন। প্রথমে কোথায় সাপ বলে কোলা ব্যাঙের মতো একটি লাফ দিল পালোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে লালটু বলল, ওই তো তোমার হাতে। কোমরে বাঁধবার চেষ্টা করছ।

বলিস কী!

বলেই নিজের হাতের দিকে তাকাল পালোয়ান, কোমরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে ত্রাহি একটা ডাক ছাড়ল। 'বাবারে খাইছে আমারে'। তারপর কুকুরের লেজে জ্বলন্ত তারাবাতি বেঁধে দিলে কুকুর যেমন দিকবিদিক ছুটতে থাকে আচমকা তেমন করে একটা ছুট লাগাতে গেল। আর সাপটা এমন করে ছুঁড়ে ফেলল, কোনদিকে যে ফেলল খেয়াল করল না। সাপটা গিয়ে মালার মতো পড়ল শুটকির গলায়। ভঙ্গিটা এমন যেন খুবই আদুরে ভঙ্গিতে স্বামী তার স্ত্রীর গলায় মালা পরাচ্ছে। এমনিতেই সাপের ভয়ে কাঠ হয়েছিল শুটকি তার ওপর সেই সাপ এসে পড়ল তার গলায়, শুটকি আর রা করার সুযোগ পেল না। জ্ঞান হারিয়ে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ওদিকে এতসব কাণ্ডকারখানা দেখে বেদিশে হয়ে রমাকান্ত আবার লালটুর রূপ ধরে ফেলেছে। এমনিতেই পালোয়ান তখন আর নিজের মধ্যে নেই এই অবস্থায় দেখে অজ্ঞান শুটকির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লালটু। দেখে 'বাবারে ভূতে ধরল রে' বলে ঝড়ের বেগে একখানা দৌড় লাগাল। খানিক দূর গিয়ে মুহূর্তের জন্য ফিরল, ফিরে থাবা দিয়ে অজ্ঞান শুটকিকে তুলল, তোলার ভঙ্গিটি এমন যেন মাটিতে ফেলে রাখা খেলনা পুতুল তুলছে কোনও শিশু। তারপর আবার আগের

মতো দৌড়।

পালোয়ানের এই দৌড় দেখে দুজন লালটু অর্থাৎ রমাকান্ত এবং লালটু হি হি হি হি করে হাসতে লাগল। আজকের আগে এমন শিক্ষা পালোয়ানকে কেউ দিতে পারেনি। এত ভয়ও পালোয়ানকে কেউ দেখাতে পারেনি। ফলে রমাকান্তের ওপর খুবই খুশি হল লালটু। গদগদ গলায় বলল, তুমি খুবই ভালো ভূত রমাকান্ত। থাক আমার সঙ্গে। তুমি সঙ্গে থাকলে দুনিয়ার বেবাক ত্যাঁদড় ঠিক করে ফেলব আমি।